দুইটি বৈঠকখানা ;—একটি সতীশ বাবুর আফিস, অপরটি তাঁহার পুত্র বিমলকুমারের পড়িবার ঘর ; বন্ধুবান্ধব আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলে এই ঘরে শয়নের ব্যবস্থাও আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্র একটি প্রাঙ্গণ—তাহার তিন পাশে বারান্দা। একটি বারান্দার কোণে সিঁড়ি—তাহার মুখে একটি কেরোসিনের ঢিবরী জ্বলিতেছে। সতীশ বাবু সিঁড়ি উঠিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন। একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর বহি কাগজ ছড়ান, মাঝখানে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছে। সমস্তটা-কাঠের একখানি চেয়ার তাহার সম্মুখে।

রামটহল রামটহল বলিয়া সতীশবাবু ভৃত্যকে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না। চেয়ারে বসিয়া জুতার ফিতা খুলিতে আরম্ভ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার পত্নী সরমা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বর্ত্তমান যুগের "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ" ও "নারী-অধিকার" তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা থাকায়, সরমা স্বামীর জুতা খুলিয়া লই-লেন, চটি জুতা পরাইয়া দিলেন। সতীশ তখন উঠিয়া, চাপকানের পকেট হইতে অদ্যকার উপার্জ্জন চারিটি টাকা বাহির করিয়া স্ত্রীর হস্তে দিয়া, চাপকান কামিজ ও গেঞ্জি একে একে পরিত্যাগ করিলেন। সরমা টাকা চারিটি টেবিলের উপর রাখিয়া, স্বামী-পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি আলনায় ঝুলাইয়া তাঁহার ধুতিখানি আনিয়া দিলেন। টাকা চারিটি বাক্সে বন্ধ করিতে করিতে বলি-লেন, "তুমি হাত মুখ ধুয়ে ফেল, আমি জলখাবার নিয়ে আসি।"

সতীশ বলিলেন, "মনোরমা কোথা ?"—মনোরমা তাঁহার কন্যার নাম।

"রান্নাঘরে রুটি বেলছে।"

"বিমল ?"

"গড়ের মাঠে খেলা দেখতে গেছে, এখনও ফেরে নি।"

দেওয়ালে ঘড়ির পানে চাহিয়া সতীশ দেখিলেন, প্রায় ছয়। "এখনও ফেরে নি!"—বলিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া তিনি পদাদি ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একটি রেকাবীতে খানকতক পেঁপের টুকরা ও ছুইটি ক্ষুদ্র র গোল্লা আনিয়া সরমা টেবলের উপর রাখিলেন। জানালার সোরাই-ভরা জল ছিল, এক গেলাস জল ঢালিয়া আনিলেন।

জলযোগ করিতে করিতে সতীশ বাবু জিজ্ঞাসা করি "আজকের সারাদিনের খবর কি বল।"

সরমা বলিলেন, "আজ সেই ঘটকী এসেছিল। একটি পাত্রের সন্ধান দিয়ে গেল।"

"কি রকম পাত্র ?"

"ছেলে বি-এ পড়ছে। বাপ মুঙ্গেরের সবজজ। নামটাম সব লিখে দিয়ে গেছে।"—বলিয়া সরমা আঁচল হইতে খুলিয়া এক টুকরা কাগজ স্বামীর হস্তে দিলেন।

সতীশ বাবু পড়িয়া বলিলেন, "ছেলে বি-এ পড়ছে, বাপ সব-জজ—এ হাতী কেনবার ক্ষমতা কি আমার হবে ?"

সরমা বলিলেন, "ছেলে নাকি বলেছে, মেয়ে যদি পছন্দ হয়, তবে টাকাকড়ির জন্যে আটকাবে না। তার বাপ মা খুব ভাল লোক, বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগার করার মৎলব তাঁদের মোটেই নেই।"

"ছেলে বলেছে—ছেলের বাপ মা ত বলেনি! ছেলে বল্লেই
দি হত তা হলে আর ভাবনা কি ছিল?"

"ছেলে বলেছে, তার বন্ধুরা প্রথমে এসে দেখবে। মেয়ে যদি
ছন্দ হয়, তা হলে বাপকে আমাদের চিঠি লিখতে হবে।"

সতীশ বাবু কিঞ্চিৎ ভাবিয়া, ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,
চ্ছা, মেয়ে দেখুক এসে। আমার মনোরমাকে অপছন্দ বোধ
হবে না।"

বিমলকুমার এই সময় আসিয়া পৌঁছিল। ছেলেটির বয়স পঞ্চ-
বর্ষ—হৃষ্টপুষ্ট সুস্থকায়। ফুটবল ম্যাচে কোন্ পক্ষ কিরূপ
তার সহিত বিপক্ষকে 'গোল' দিয়াছে, তাহারই বিবরণ
সিত স্বরে পিতার নিকট সে ব্যক্ত করিতে লাগিল। মনো-
ও রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া ময়দা-হাত ধুইয়া ফেলিয়া,
সিয়া দাঁড়াইল। হাসিমুখে বিস্ফারিত নেত্রে দাদার গল্প শুনিতে
গিল। মেয়েটি সুন্দরী; ইহাকে দেখিয়া যে বর অপছন্দ
করিবে, ডানাকাটা পরী ভিন্ন আর কেহই তাহার কৌমার্য্য ঘুচা-
ইতে পারিবে না।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে দেখা গেল, পাশের ঘরে মেঝের উপর শতরঞ্চের
মধ্যভাগে সতীশ বাবু বসিয়া গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছেন—
তাঁহার একদিকে বিমল, অপর দিকে মনোরমা বসিয়া নিজ নিজ
পাঠ অভ্যাসে নিযুক্ত। সতীশ বাবু প্রতিদিন সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা
কাল এইরূপে পুত্রকন্যা দুইটিকে পড়াইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পটলডাঙ্গার কোনও ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে আজ প্রাতঃকাল হইতে তিনটি তরুণবয়স্ক বন্ধুতে মিলিয়া গোপন পরামর্শের ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছে। শচীন্দ্র (পূর্ব্বোক্ত সবজজ বাবুর পুত্র) বলিতেছে, "না ভাই, সে আমি পারব না—তোমরাই যাও।"

ক্ষিতীশ বলিতেছে, "কেন, তোর ভয়টা কিসের? এমন নার্ভাস্ হলে চলবে কেন?"

নির্ম্মল বলিতেছে, "না না, তুমিও চল হে শচীন্। তারা কি তোমাকে কোনও দিন দেখেছে যে চিন্‌তে পারবে?"

ব্যাপারটা এই—ঘট্‌কী প্রমুখাৎ সতীশ বাবুকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, আজ রবিবার অপরাহ্ণকালে বরের দুইজন বন্ধু খিদিরপুরে গিয়া কন্যা দেখিবেন। সতীশ বাবুও সম্মতি জানাইয়াছেন। বরের আত্মীয় ও বাল্যবন্ধু ক্ষিতীশ এবং নব্যকবি ও ললনাসৌন্দর্য্যের বিশেষজ্ঞ নির্ম্মল গিয়া কন্যা দেখিয়া আসিবে, এইরূপ পরামর্শই ছিল। আজ ক্ষিতীশ প্রস্তাব করিয়াছে, স্বয়ং বরও নিজের বন্ধু সাজিয়া এই কমিশনের মেম্বর হইলে মন্দ হয় না,—নির্ম্মলও উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, পরামর্শ এই তিনটি বন্ধুর মধ্যে সীমাবদ্ধ—মেসের আর কেহ এ কথার বিন্দুবিসর্গও জানে না।

শচীন্দ্র বলিল, "তোমরা দুজনে যাচ্ছ যাও, আমাকে আবার টান কেন? কথায় বার্ত্তায় যদি কোনও রকমে টের

পেয়ে যায় যে আমিই বর! বিশেষ বর যাবে, সে কথা তাদের ত বলে' পাঠান হয়নি—বরের দু'জন বন্ধু যাবে, এই কথাই বলা হয়েছে।"

ক্ষিতীশ বলিল, "না হয় দুজনের জায়গায় তিনজন বন্ধুই হল, তাতে আর আপত্তি কি? অধিকন্তু ন দোষায় হুঁকোর জল ছাড়া। কথাবার্ত্তা যা ক'বার আমরাই কইব। তুই শুধু চুপ করে বসে থাকবি, আর চোখ দুটো দিয়ে বেশ করে দেখে নিবি। তোর জিনিষ, তুই ভাল করে দেখে নিবিনে হতভাগা? এ কি কলেজে প্রেজেন্ট হওয়া যে প্রক্সি দিয়ে কায চলে যাবে? কি বল নির্ম্মল?"

নির্ম্মল বলিল, "ঠিক ত।"

শচীন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, বন্ধু সেজেই না হয় গেলাম। কিন্তু হঠাৎ যদি নাম জিজ্ঞাসা করে বসে?"

ক্ষিতীশ বলিল, "পাগল! সে কি একটা অজবুক মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে ভূত যে নাম ধাম 'ব্যাতন' সব জিজ্ঞাসা করবে?—সে একজন এম-এ বি-এল!"

আরও কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর শচীন্ রাজি হইল। সাজগোজ করিয়া বেলা তিনটার সময় বাহির হইয়া তিন বন্ধু ট্রামযোগে ধর্ম্মতলায় গেল। তথা হইতে যাতায়াতের ভাড়া করিয়া একখানি রবার দেওয়া ফেটন গাড়ী লইয়া, বেলা চারিটার সময় খিদিরপুরে সতীশ বাবুর বাড়ী পৌছিল।

সতীশবাবু প্রস্তুত হইয়া আফিসঘরে বসিয়া ছিলেন, গাড়ী

দাঁড়াইবামাত্র বাহিরে আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া যুবকত্রয়কে নামাইয়া লইলেন। বিমল সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সে ছুটিয়া উপরে খবর দিতে গেল।

ইহাদিগকে লইয়া সতীশ বাবু আপিসঘরে প্রবেশ করিলেন। একখানি টেবিলের ধারে একখানি মাত্র চেয়ার। পাশে লম্বা চৌড়া তক্তপোষের উপর জাজিম বিছানো—তাহার উপর গুটি-কয়েক তাকিয়া বালিস। সতীশ বাবু নিজে সেই তক্তপোষের উপর বসিয়া, যুবকগণকেও তথায় বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বিমলও আসিয়া পিতার নিকট বসিল।

বর্ত্তমানকালে বরপণপ্রথা সম্বন্ধে সতীশ বাবু আলোচনা উত্থাপন করিলেন। দেখিলেন, যুবকগণের অভিমত যে, এ প্রথা একান্ত অভদ্র, নৃশংস ও বর্ব্বরোচিত। সতীশ বাবু কাহারও নাম জানিতে চাহিলেন না বটে, তবে কে কি পড়ে এবং কোথায় থাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাপ্মা কয় ভাই, কোন্ কোন্ পরীক্ষা কোন ডিবিজনে সে পাস করিয়াছে, তাহার স্বাস্থ্য কেমন—এ সকল সংবাদও লইলেন।

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সতীশ বাবু বলিলেন, "আপনারা একটু বসুন—আমি আসছি।"—বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

বিমলকে লইয়া তিনি উঠিয়া গেলেই ক্ষিতীশ বলিল, "বোধ হয় মেয়ে আনতে গেলেন, নয়?"

নির্ম্মল বলিল, "নিশ্চয়। ভাইটির চেহারা দেখে ত মনে হয়, বোনটি মনোনীত হলেও হতে পারে।

শচীন্ অনুচ্চস্বরে হাসিয়া বলিল, "মনোনীত হবার কথা বলছ, বোন্‌টি কি কবিতা?"

নির্ম্মল বলিল, "দেখি, তোমার ভাগ্যে কি রকম কবিতা যোটে।"

কয়েক মিনিট পরে ঝুম্‌ঝুম্ মলের আওয়াজ আসিল। যুবকত্রয় মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে পরস্পরের পানে চাহিল। সতীশ বাবু কন্যা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

মনোরমা একখানি জড়ি-পাড় খয়ের-রঙের শাড়ী পড়িয়াছে, গায়ে সেই রঙের একটি রেশমী জ্যাকেট্, হাতে চারিগাছি করিয়া আটগাছি হরতন-চিড়িতন চুড়ি, মাথায় একটি পালিসপাত চিরুণী ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি প্রজাপতি-কাঁটা। টেবিলের কাছে যে একখানি মাত্র চেয়ার ছিল, কন্যাকে সতীশবাবু তাহাতেই বসাইয়া বলিলেন, "এইটি আমার মেয়ে।"—মেয়ে নত-নেত্রে চেয়ারে বসিয়া, যুবকগণকে একটি নমস্কার করিল।

ক্ষিতীশ ও নির্ম্মল উভয়েই আশা করিতেছে, অপর জন মেয়েটির সঙ্গে কথা কহিবে। নির্ম্মলকে বাঙবিমূঢ় দেখিয়া শেষে ক্ষিতীশচন্দ্রই বলিল, "তোমার নামটি কি?"

মেয়েটি চক্ষু না তুলিয়াই বলিল, "মনোরমা।"

"কি পড়?"

"এখন গ্রিম্‌স্ ফেয়ারি টেলস্ পড়ছি।"

যুবকগণ মনে ভাবিতেছিল, বালিকা 'আখ্যানমঞ্জরী', 'চারুপাঠ' —বড় জোর 'সীতার বনবাস' অথবা 'মেঘনাদবধ' পড়ে বলিবে। সুতরাং পুস্তকের নামে ও উচ্চারণের বিশুদ্ধতায় তাহারা

একটু চমকিত হইল ; খুসীও হইল। নির্ম্মল এইবার কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোন্ স্কুলে পড় ?"

"স্কুলে পড়িনা, বাবার কাছে পড়ি।"

"বাঙ্গালা কতদূর পড়েছ ?"

সতীশ বাবু বলিলেন, "বাঙ্গলা সমস্ত ভাল ভাল বই-ই ও পড়েছে।"

নির্ম্মল মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিল, "রবিবাবুর কাব্য পড়েছ ?"

"পড়েছি।"

"কোনও কবিতা মুখস্থ বল্‌তে পার ?"

মনোরমা অবনত মুখে ঈষৎ হাস্য করিল। তাহার পিতা বলিলেন, "রবি বাবুর অনেক কবিতাই ওর মুখস্থ। বল ত মা একটা—এঁদের শুনিয়ে দাও।"

মনোরমা মৃদুস্বরে গলা ঝাড়িয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—

একদা পুলকে প্রভাত আলোকে
গাহিছে পাখী

হইতে আরম্ভ করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিয়া নীরব হইল।

ক্ষিতীশ বলিল, "বাঃ—সুন্দর। লেখাপড়া ত বেশ ভালই দেখছি। আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। রান্নাবান্না কিছু শেখা হয়েছে কি ?"

মনোরমা মস্তকসঙ্কেতে জানাইল যে তাহাও হইয়াছে।

সতীশ বাবু বলিলেন, "সে বিষয়েও আমার মেয়ের খুঁৎ পাবেন না। ঘরের কাযকর্ম্ম, রান্নবান্না—সবই মা আমার শিখে নিয়েছেন। দু'দিন বামুন পালালে বাজারের খাবার আনাতে হবে না—মোটামুটি ডালভাত-তরকারী রেঁধে বাড়ীর সবাইকে খাইয়ে দিতে পারবেন।"

ক্ষিতীশ বলিল, "বেশ বেশ। এইটি শুনে সব চেয়ে খুশী হলাম সতীশ বাবু। নির্ম্মল, তুমি রাগ কোরোনা ভাই, রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করতে পারার চেয়ে, অসময়ে বাড়ীর লোকের উপবাস নিবারণ করতে পারা অল্প বাহাদুরী নয়।"

এ কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

সতীশ বাবু বলিলেন, "তা ঠিক। আর কিছু যদি জিজ্ঞাসা করতে চান, তাও করুন।"

ক্ষিতিশ বলিল, "না, আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে না। দেখে শুনে আমরা খুবই খুসী হয়েছি সতীশ বাবু, আর এখন এঁকে কষ্ট দেব না।"

"আচ্ছা, একটু বসুন তবে।"—বলিয়া সতীশ বাবু কন্যা লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সতীশ বাবু অদৃশ্য হইবামাত্র ক্ষিতীশ শচীন্‌কে এক ঠেলা দিয়া বলিল, "কি রে, পছন্দ হল?"

শচীন বলিল, "তোমাদের কি মত, তাই আগে শুনি।"

ক্ষিতীশ বলিল, "আমার ত ভালই লাগল।"

নির্ম্মল ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "মেয়েটি সুন্দরী, তবে পরী বলা যায় না।"

শচীন বলিল, "আমার বেশ লাগলো। পরী ফরীতে আমার দরকার নেই ভাই।"

ক্ষিতীশ হাসিয়া বলিল, "কিরে সত্যি বল্‌ছিস্?"

শচীন বলিল, "খুব সত্যি। নির্ম্মল, তুমি কোনও গোলমাল তুলো না ভাই। একেই আমি বিয়ে করব।"

নির্ম্মল বলিল, "পরী না হোক, মেয়েটি সুন্দরী এ কথা ত আগেই বলেছি। রঙটি একেবারে গোলাপ ফুলের মত নয় বটে—কিন্তু সে আর বাঙ্গালীর ঘরে কোথা পাবে? সে চাইলে, পার্সী কি আর্ম্মাণী মেয়ে খুঁজতে হয়। সংস্কৃতে যাকে বলে গৌরী, এ মেয়ে তা বটে। মুখে, চোখে, গড়নেও তেমন কোন খুঁৎ নেই। তা, একে তুমি বিয়ে করতে পার শচীন্।"

শচীন বলিল, "ইচ্ছে ত তাই। কপালে এখন ফস্কে না যায়, সেইটি তোমরা দেখো দাদা।"

সরমা স্বামীকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বুঝলে? পছন্দ হল? কি কি সব জিজ্ঞাসা টিজ্ঞাসা করলে?"

সতীশ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "খুবই জেরা করেছে—যেন এক একটি কৌঁসুলি বসে গেছেন!—কেবল একটি ছেলে ছিল, নিতান্ত ভালমানুষ। আর দুটো—জ্যেষ্ঠতাত! পছন্দ ত হয়েছে বলেই বোধ হল। জলটল খাবার ঠিক আছে ত?"

"আছে; পাশের ঘরে সব সাজিয়ে রেখেছি। নিয়ে এস তাদের।"

জলযোগান্তে, গাড়ীতে উঠিবার সময় ক্ষিতীশ বলিল, "সতীশ বাবু, এক মিনিট একটা কথা আছে; একটু এই দিকে আসুন।"

সতীশ বাবু বলিলেন, "রাস্তায় কেন? ঘরেই আসুন তা হলে—ওঁরা গাড়ীতে বসুন একটু।"

বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া ক্ষিতীশ চুপি চুপি বলিল, "মেয়ে, বরের পছন্দ হয়েছে।"

সতীশ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "হয়েছে? কি করে জানলেন?"

ক্ষিতীশ হাসিয়া বলিল, "ঐ যিনি চুপচাপ বসে ছিলেন, তিনিই বর। ওঁর বাপের ঠিকানা এই নিন, তাঁকে আপনি চিঠি লিখুন। তবে, আমরা যে ঘট্‌কী পাঠিয়েছিলাম, দেখতে এসেছি, এসব কথাগুলো কাইগুলি গোপন রাখ্‌বেন। আপনি যেন কারু কাছে খবর পেয়েছেন যে অমুক বাবুর একটি বিয়ের যুগ্যি ছেলে আছে সে কলকাতায় পড়ে, এই খবর পেয়েই যেন আপনি লিখছেন—বুঝলেন?"

সতীশ বাবু বলিলেন, "আচ্ছা বাবাজী বস বস—চিঠি আমি কালই লিখ্‌ব—আর, এ সব কথা প্রকাশও করব না। কিন্তু সবজজ্‌ বাবু যদি অনেক টাকা হেঁকে বসেন, তা হলে কি হবে? আমি ওকালতী করি বটে, কিন্তু অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছ

বাবাজী—কোনও রকমে দিন গুজরান করি। বেশী টাকা আমি কোথা পাব ?”

ক্ষিতীশ বলিল, “সে জন্যে আপনি ভাববেন না। সে ঠিক করে’ নেওয়া যাবে এখন। শচীনের বাপ মহেন্দ্র বাবুকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখছি কি না;—একজন উঁচুদরের লোক তিনি। জেঠাইমাও খুব ভাল। এ বিয়ে যাতে হয় সে আমরা করব—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার কাছে আর গোপন করে কি হবে—আপনার মেয়েকে, আমাদের শচীনের ভা—রী পছন্দ হয়েছে।”

“আচ্ছা, কালই আমি চিঠি লিখ্‌ব।”—বলিয়া সতীশ বাবু বাহিরে আসিয়া ক্ষিতীশকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। “নিতান্ত ভালমানুষ” ছেলেটির প্রতি পূর্ব্বে তিনি ততটা নজর করেন নাই—এইবার উত্তমরূপে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। সতীশ বাবুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিজের প্রতি স্থাপিত জানিয়া বিব্রত হইয়া শচীন্দ্র মাথা হেঁট করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কালব্যাজ না করিয়া সেই রাত্রেই সতীশ বাবু বরের পিতাকে পত্র লিখিতে বসিলেন। শচীন্‌কে তাঁহারও ভারী পছন্দ হইয়াছে; ছেলেটি যেমন শিষ্ট শান্ত, দেখিতেও তেমনি সুশ্রী স্বাস্থ্যবান্।

সরমা বলিতে লাগিলেন, "এমন পাত্রটি মনোর ভাগ্যে কি হবে!"

চতুর্থ দিনে মুঙ্গের হইতে পত্রোত্তর আসিল। সবজজ মহেন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"এই মাঘ মাসেই শচীন বাবাজীবনের বিবাহ দেওয়া আমার সহধর্ম্মিণীর বিশেষ ইচ্ছা,—কারণ আগামী বৎসর বাবাজীবনের এগ্‌জামিনের তাড়া আছে এবং এগ্‌জামিন শেষ হইলে তাহার যোড়া বৎসর পড়িবে। কিন্তু প্রথমে মেয়েটি দেখা আবশ্যক। দুই একজন বন্ধু সমভিব্যাহারে গিয়া আপনার কন্যাটিকে দেখিয়া আসিবার জন্য বাবাজীবনকে অদ্য পত্র লিখিলাম। মেয়েটি যদি পছন্দ হয় এবং অন্যান্য বিষয়ও যদি মনঃপূত হয়, তবে মাঘ মাসেই বিবাহ হইতে পারিবে।"

পত্র পড়িয়া সরমা হাসিয়া বলিলেন, "বাবাজীবন যে রাম না হতেই রামায়ণ সেরে বসে আছেন তা ত কর্ত্তার খবর নেই! অন্যান্য বিষয়টা কি?"

সতীশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঐ অন্যান্য বিষয় নিয়েই ত যত গোল! ওর মানে, 'দরে যদি পটে'—এই আর কি।"

পত্র লিখিয়া, রবিবারে শচীন্ ও ক্ষিতীশকে সতীশ বাবু নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা আসিলে চিঠি দেখাইলেন।

ক্ষিতীশ বলিল, "মেয়েটিকে আর একবার তা হলে দেখান। দেখে, এইখানে বসেই আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

সতীশ বাবু অন্দরে গেলেন। গৃহিণী আপত্তি করিতে লাগিলেন, "এই স্নান করেছে, এখনও চুল শুকোয় নি, বাঁধা হয়নি—এখন দেখাব কি করে?"

সতীশ ফিরিয়া আসিয়া ইহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করে নাও, ও-বেলা দেখো এখন।"

ক্ষিতীশ বলিল, "আজ্ঞে সে কি হয়? এক ঘণ্টার বেশী ত আমরা থাকতে পারব না। কেন, এখন দেখাতে বাধা কি?"

সতীশ বাবু গুঁইগাঁই করিয়া অবশেষে বাধা কি তাহা প্রকাশ করিলেন।

শুনিয়া ক্ষিতীশ হাসিয়া উঠিল। বলিল, "নেইবা চুল বাঁধা হল—তাতে হয়েছে কি?—হাহাহা! খোলা চুলে দেখলামই বা। আপনিও যেমন! ওসব ফর্ম্মালিটি আমরা মানি-টানিনে। নিয়ে আসুন নিয়ে আসুন—জষ্ট্ অ্যাজ্ সি ইজ্। আসল কথা কি জানেন সতীশ বাবু, জেঠামশায়কে এই যে চিঠি লিখ্‌ব 'আসিলাম, দেখিলাম'—এ কথাগুলো মিথ্যে না হয়ে যায়।"

সতীশ বাবু মনে মনে বলিলেন, "জ্যেষ্ঠ—তাত!"—প্রকাশ্যে বলিলেন, "আচ্ছা বসুন, নিয়ে আসি।"

সতীশ বাবু যাইবামাত্র ক্ষিতীশ তাহার বন্ধুকে ঠেলিয়া বলিল, "আর একবার দেখবার জন্যে মরছিলি দম ফেটে—কেমন ফাঁকি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্চি তোকে! দে হতভাগা, সন্দেশ খাইয়ে দে।"

মেয়ে দেখা হইল। আহারের পর সেইখানে বসিয়াই ক্ষিতীশ মুঙ্গেরে পত্র লিখিয়া, বন্ধুসহ বিদায়গ্রহণ করিল।

চতুর্থ দিনে আবার মুঙ্গের হইতে পত্র আসিল। সবজজ্ বাবু লিখিয়াছেন, মেয়ে পছন্দ হইয়াছে, এখন অন্যান্য বিষয় স্থির হওয়া আবশ্যক। সতীশ বাবু যদি আগামী শনিবার লুপ মেলে রওনা হইয়া মুঙ্গেরে একবার পদধূলি দেন, তবে রবিবারে সে সব কথা আলোচনা করিয়া, ঐদিনই বৈকালের ট্রেণে তথা হইতে আবার তিনি ফিরিতে পারিবেন।

মনে মনে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে সতীশ বাবু মুঙ্গের যাত্রা করিলেন।

* * * * * *

সোমবার প্রাতে সতীশ বাবু যখন মুঙ্গের হইতে বাড়ী ফিরিলেন, তখন তাঁহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে—এবং তাহা কেবল গাড়ীর কষ্টের জন্যই নহে।

অনেক কাকুতি মিনতি ও কষামাজা করিয়া দর দাঁড়াইয়াছে —অলঙ্কার ও বরাভরণ প্রভৃতি ২০০০ টাকার, এবং ৫০১ টাকা নগদ। নিজেদের খরচের জন্যও অন্ততঃ ৫০০ টাকা ধরিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং একুনে তিন হাজার।

সরমা শুনিয়া বলিলেন, "তা, আজকালের বাজারে এর কমে অমন ঘর-বর আর কোথায় পাওয়া যাবে! তুমি কি বলে এলে?"

সতীশবাবু বলিলেন, "বলেছি, বাড়ী গিয়ে পরামর্শ করে, যেমন হয় আপনাকে জানাব। তিনি বল্লেন বেশী দেরী করবেন না,—আরও দুই এক জায়গায় কথাবার্ত্তা হচ্চে, মাঘ মাসেই শুভকর্ম্মটি শেষ করতে চাই।"

দুই তিন দিন ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক পরামর্শ হইল। সরমার পিতা মৃত্যুকালে তাহাকে পাঁচশত টাকার একখানি কোম্পানির কাগজ দিয়াছিলেন, সেখানি আছে; অলঙ্কার যাহা আছে তাহা বেচিলে হাজার দেড়েক টাকা হইতে পারে। বাকী থাকে হাজার টাকা। তা, এত বন্ধুবান্ধব রহিয়াছে, হাজার খানেক টাকা ঋণ সংগ্রহ কি অসম্ভব হইবে?

সতীশ বলিলেন, "এতদিনে একখানি গহনা তোমায় দিতে পারলাম না,—যা দু'চারখানা আছে তাও বেচে ফেলব?"

সরমা বলিলেন, "তা হোক। তুমি বেঁচে থাকলে আমার অনেক গহনা হবে। আমার পাঁচটা নয় সাতটা নয় ঐ একটা মেয়ে, মনের মতন পাত্রটি যদি পাওয়াই গেল তবে তাকে হাত ছাড়া করে কায নেই। তুমি চিঠি লিখে দাও যে তাতেই আমরা রাজি—এদিকে টাকার চেষ্টায় থাক। মাঘমাসে বিয়ে, এখনও ত দেরী আছে!"

সতীশ বাবু সেইরূপই পত্র লিখিয়া দিলেন। মহেন্দ্র বাবু উত্তর দিলেন, সম্মুখে বড়দিনের ছুটি, সেই ছুটির সহিত যোগ করিয়া তিনি আরও একমাস ছুটির জন্য আবেদন করিয়াছেন। সপরিবারে তিনি কলিকাতায় পৌছিলে বিবাহের দিনস্থির, পাকা দেখা প্রভৃতি হইবে। বাড়ীভাড়া করিবার জন্য পুত্রকে পত্র লিখিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন ধরিয়া বন্ধুবান্ধবগণের নিকট অনেক হাঁটাহাঁটি করিয়া, মাত্র দুইশত টাকা ঋণ সংগ্রহ হইল। এখনও বিস্তর বাকী। উপকার করিতে পারে এমত বন্ধুবান্ধব কলিকাতায় আর কেহ নাই—এখন একমাত্র ভরসা হেমন্ত দাদা। তিনি সতীশের মামাতো ভাই, বর্দ্ধমানে ওকালতী করেন, উপার্জ্জনও মন্দ নহে। গুজব, তিনি নাকি বিশ হাজার টাকা জমাইয়াছেন। একটু কৃতজ্ঞতার দাবীও ছিল—সতীশের পিতাই তাঁহাকে লেখা-পড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। সতীশ বাবু নিজের দায় জানাইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন—টাকাটা পাইলে, মাসে মাসে ২৫৲ হিসাবে তিন বৎসরের মধ্যে উহা পরিশোধ করিয়া দিতে পারিবেন এমত আভাসও দিলেন। হেমন্ত বাবু লিখিলেন—"বড় দিনের বন্ধের মধ্যে একদিন আসিও, কতদূর কি করিতে পারি দেখি—তবে আমারও সময় ভাল যাইতেছে না।"

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রতিদিনই এখন কন্যাবিবাহের জল্পনা কল্পনা চলে। মহেন্দ্র বাবু গহনার ফর্দ্দ যাহা দিয়াছেন, তাহার দুইখানি মাত্র গৃহিণীর অলঙ্কারের অনুরূপ—তবে সেগুলি কনে গহনা নহে, ওজনে অপেক্ষাকৃত ভারি। গৃহিণী বলিলেন, "তা হোক, ও আর ভেঙ্গে কায নেই, রঙ করিয়ে নিলেই নতুনের মত দেখাবে। দু'ভরি বেশী আছে তা থাকুক; পরকে ত দিচ্ছিনে—নিজের মেয়ে জামাইকেই ত দিচ্ছি।"—বাকীগুলি ভাঙ্গিতে হইবে।

স্যাকরা বলিয়াছে, বিবাহের দিন পনেরো আগে পাইলেই সময়মত সে সমস্তই ঠিক করিয়া দিতে পারিবে।—দেশ হইতে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাহাকে কাহাকে আনিতে হইবে, সে পরামর্শও চলিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বড়দিনের ছুটি আসিয়া পড়িল। ক্ষিতীশ ইতিমধ্যে একদিন আসিয়াছিল। সে বলিল, জেঠা মহাশয়ের আদেশ অনুসারে দুইমাসের জন্য বউবাজারে তাঁহার জন্য বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে।

যেদিন কাছারি বন্ধ হইল, তাহার পরদিনই সতীশ বাবু অর্থ সংগ্রহ করিতে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। গিয়া দেখিলেন হেমন্ত দাদার মনটা কিছু ভার-ভার। জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, আমার টাকাটা ঠিক আছে ত?"

হেমন্ত বাবু বলিলেন, "ঠিক আর আছে কৈ?—আমার হাতে ত নেই, থাকলে কোনও কথাই ছিল না। রোজগার পত্রও বড়ই মন্দা পড়ে গেচে—বছর বছর খরচ যেমন বাড়ছে, আয়ও তেমনি তেমনি কমছে। কাযকর্ম্ম ভয়ানক ডল্। তার উপর আবার উকীলের সংখ্যা বর্দ্ধমানে এত বর্দ্ধমান যে, রাস্তায় একটা লাঠি মারলে তিনটে উকীল মরে যায়। রাস্তায় বেরিয়ে দেখ—উকীল থাকে না এমন দশখানা বাড়ী উপরোউপরি পাবে না। একধার থেকে তক্তা ঝুলছে—শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক, উকীল, জজ-কোর্ট। মফস্বল বারের সে দিন আর নেই রে ভাই। এখন পেট চলা দুষ্কর—তার উপর গাড়ীঘোড়া কিনে আরও বিপন্ন

হয়েছি। আমি ত আমি,—গিয়ে দেখগে, বড় বড় নামজাদা সব উকীল, বার-লাইব্রেরীতে বসে হাই তুলছেন আর গুড়ুক ফুঁকছেন।

এই বক্তৃতা শুনিয়া সতীশচন্দ্রের বুক দমিয়া গেল। দাদা বিশ হাজার টাকা জমাইয়াছেন এ কথা দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি শুনিয়াছিলেন। সুতরাং টাকা নাই ইহা একটা অছিলামাত্র। টাকা যথেষ্টই আছে; দিবার যদি ইচ্ছা না থাকে তবে সে স্বতন্ত্র কথা। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে দাদা আমার উপায় কি হবে? বারো বছরের মেয়ে গলায় বেঁধে কি আমি ডুববো?"

হেমন্ত বলিলেন, "দুই একজন বন্ধুকে বলে রেখেছি; টাকাটা তাঁদের কাছে ধার পেলেও পাওয়া যেতে পারে। কতকটা সেই ভরসাতেই তোমাকে আসতে বলেছিলাম। বৈকালে বেরুব একবার। এখন বেলা হল, স্নান টান করে ফেল ভায়া।"

বেলা সাড়ে তিনটার সময় গাড়ী যোতাইয়া হেমন্ত বাবু বাহির হইলেন। যে সকল হাকিম ছুটিতে কোথাও যান নাই, বর্দ্ধমানেই আছেন, তাঁহাদের বাসায় গিয়া, নানা খোসগল্প ও চাটুবাক্যে তাঁহাদিগের সন্তোষবিধান করিয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফিরিলেন। সতীশ তীর্থের কাকের মত আশায় বুক বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। হেমন্ত মুখখানি নিতান্ত বিষণ্ণ করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "কোথাও সুবিধে হল না। তারা বল্লে হাঁ আপনাকে বলেছিলাম বটে, কিন্তু বড়ই এখন টানাটানি, দুচার

মাস পরে বরং হতে পারে।—চেষ্টা ত করলাম, কি করি বল ভায়া! আমি বলি কি, কলকাতাতেই বরং আর একবার চেষ্টা করে দেখগে।"

রাত্রি নয়টা সাতাশ মিনিটের প্যাসেঞ্জারে সতীশ বাবুর কলিকাতায় ফিরিবার কথা। একটা দিন থাকিবার জন্য হেমন্ত বাবু অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সতীশ বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন না। আহারের জন্য আসনে বসিলেন মাত্র; খান দুই লুচি খাইয়াই তাঁহার ক্ষুধা ফুরাইয়া গেল। সতীশের পুত্রকন্যার জন্য হেমন্ত বাবু এক হাঁড়ি সীতাভোগ এবং এক হাঁড়ি মিহিদানা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাই লইয়া, নয়টার পূর্ব্বেই হেমন্ত বাবুর গাড়ীতে তিনি ষ্টেশন রওয়ানা হইলেন। আকাশে মেঘ করিয়াছে, বাতাস বহিতেছে—শীতটাও আজ কন্‌কনে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ট্রেণ ছাড়িল। মধ্যম শ্রেণীর একখানি বেঞ্চির কোণে বসিয়া, জুতা খুলিয়া পা তুলিয়া পায়ে শাল ঢাকা দিয়া সতীশ বাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন। বড় আশা করিয়াই তিনি হেমন্ত দাদার নিকট আসিয়াছিলেন। সেই আশা ভঙ্গ হওয়ায় তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। মনোরমা জন্মিয়া অবধি তাঁহার সাধ ছিল, একটি সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র অবস্থাপন্ন পাত্রে

তাহাকে অর্পণ করিবেন। সে সাধ আর পূর্ণ হইল না; এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। হাজার দেড়েক টাকায় হয় এমন একটি পাত্রের সন্ধান করিতে হইবে। সে পাত্র যে কেমন হইবে, তাহা মনোরমার অদৃষ্ট-বিধাতাই জানেন। বাড়ী ফিরিলে এই বিফলতার সংবাদ যখন তাঁহার স্ত্রী শুনিবে, তখন তাহার মুখখানি কেমন হইয়া যাইবে ভাবিতে ভাবিতে সতীশ বাবুর চোখের কোণে জল আসিল। সেই সে যে সুপাত্রটির জন্য নিজের সর্ব্বস্ব খোয়াইতেও প্রস্তুত হইয়াছিল,—কিন্তু এমনই অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, তাহাতেও কোন ফল হইল না!

নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেণ ছুটিয়াছে—হাওড়ায় পৌঁছিতে রাত্রি পৌনে একটা। আরোহিগণ যাহারা শয়নের স্থান পাইয়াছে তাহারা ঘুমাইতেছে, বাকী লোক বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। শীতের জন্য কামরার সমস্ত জানালাগুলি রুদ্ধ। কোন একটা ষ্টেশনে সতীশ বাবুর বেঞ্চিটা খালি হইয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া, চামড়ার ব্যাগটি মাথায় দিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। শুইয়া শুইয়া নিজের অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে অল্পে অল্পে তাঁহার নিদ্রা-কর্ষণ হইল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন দেখিলেন, গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে—অপর সকলে নামিয়া গিয়াছে। উঠিয়া ব্যাগ ও ছড়িটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে তিনি নামিলেন। সীতাভোগ ও মিহিদানার হাঁড়ি দুইটা, কুলীর হাতে দিয়া, প্ল্যাটফর্ম্ম অতিক্রম করিয়া, ঠিকা গাড়ী দাঁড়াইবার স্থানে গিয়া দেখিলেন, দুইখানি

গাড়ী মাত্র দাঁড়াইয়া আছে। অনেক দরদস্তুরের পর, দেড়টাকায় একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

বাড়ী পৌঁছিতে দুইটা বাজিল। বৈঠকখানায় ভৃত্য রামটহল শুইয়া থাকে, ডাকাডাকিতে সে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সতীশ বাবু বলিলেন, "গাড়ীর মধ্যে দুটো হাঁড়ি আছে, আর ছড়িটা—নিয়ে আয়। আর এই নে, ভাড়া দিস।"—বলিয়া তিনি আপিস ঘরে প্রবেশ করিয়া বাতি জ্বালিলেন—কি প্রয়োজন ছিল।

আপিসঘরের কাযটুকু সারিয়া ব্যাগ হস্তে সতীশ বাবু উপরে উঠিয়া গেলেন। নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সরমা দাঁড়াইয়া আছে—টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে।

সরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পেলে?"

সতীশ বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পেলাম ঐ সীতাভোগ আর মিহিদানা।"—বলিয়া তিনি মেঝের উপর রক্ষিত হাঁড়ি দুইটি দেখাইয়া দিলেন।

"টাকা?"

"টাকা পাইনি।"

সরমা হাসিয়া বলিলেন, "যাও যাও ঠাট্টা করতে হবে না। টাকা পেয়েছ। এই যে বাক্সতে টাকা।—বলা হচ্ছে পাইনি!"—বলিয়া সরমা টেবিলের উপরে একটি বাক্স দেখাইলেন।

সতীশ দেখিলেন, সবুজ বনাতের ঘেরাটোপ ঢাকা একটি বৃহৎ ক্যাশবাক্স। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কার বাক্স?"

সরমা বলিলেন, "নাও নাও, রঙ্গরস রাখ। নিজে নিয়ে এলেন, আবার জিজ্ঞাসা করছেন কার বাক্স?—সব টাকা পেয়েছ ত?"

সতীশ বাক্সটির ঘেরাটোপ মুক্ত করিয়া বলিলেন, "আমি কখন এ বাক্স নিয়ে এলাম?—পাগল না কি!"

সরমা ইহাতে বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "তুমি আন নি কি বলছ গো? এই ত এক্ষুণি রামটহল তোমার ছড়ি, হাঁড়ি দুটো আর এই বাক্স রেখে গেল।"

সতীশ বলিলেন, "রামটহল এনে রেখে গেল? কোথায় পেলে সে? আমি এ বাক্স ত কখনও চক্ষেও দেখিনি। ডাক দিকিন রামটহলকে। আচ্ছা আমিই ডাকছি।"—বলিয়া তিনি বাহিরে গিয়া ডাকিতে লাগিলেন—"রামটহল—এ রামটহল।"

রামটহল আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ি থেকে তুই কি কি নামিয়েছিস রে?"

রামটহল বলিল, "হাঁড়ি দুটো, ছড়ি, আর এই বাক্স। নীচে হাঁড়ি দুটো ছিল। উপরে, ঘোড়ার দিকে সেই বসবার জায়গায় এই বাক্স ছিল। আমি ত লণ্ঠন নিয়ে বেশ করে ভিতরে দেখেছি বাবু, আর ত কিছু ছিল না।"

সতীশ বলিলেন, "আচ্ছা যা।"

রামটহল চলিয়া গেলে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। সতীশ বাবু বাক্সটি তুলিয়া দেখিলেন, উহা বিলক্ষণ ভারি—ভিতরে ঝম্‌ঝম্ করিতেছে। বলিলেন, "এ

নিশ্চয় কেউ ঐ ঘোড়ার গাড়ীতে ফেলে গিয়েছিল, কোচম্যানও জানতে পারেনি। এখন উপায় ?"

সরমা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে একবার স্বামীর মুখ পানে, একবার বাক্সপানে চাহিতে লাগিলেন।

সতীশ বলিলেন, "কার বাক্স জানাই বা যাবে কি করে? খুলতে পারলে হয়ত কিছু সন্ধান পাওয়া যেত। কোনও চিঠিপত্র কাগজ টাগজ যদি ভিতরে থাকে।"

"কি করে খুলবে ?"

"খুলব কি ? না পুলিসে গিয়ে জমা দিয়ে আসব ?"

সরমা বলিলেন, "পুলিসে জমা দিয়ে কি হবে ? তারা কি আর, যার জিনিষ তাকে খুঁজতে যাবে ? মাঝে থেকে নিজেরাই গাপ করে ফেলবে। অতটাকা মিছামিছি পুলিসের পেটে যায় কেন ?"

"তা ঠিক, পুলিসের পেটেই বা যায় কেন ? চাবির রিঙটা দাও দেখি"—বলিতে বলিতে সতীশ বাবু দ্বার বন্ধ করিলেন।

সরমা আঁচল হইতে চাবির গোছা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "আমাদের চাবি দিয়ে খুলবে কি ?"

"দেখাই যাক্ না! তেমন দামী বিলিতী বাক্স এ নয়—সাধারণ জিনিষ।"—বলিয়া সতীশ বাবু স্ত্রীর হস্ত হইতে চাবিগুলি লইয়া, একটা বাছিয়া কলে পরাইতে চেষ্টা করিলেন। সেটা লাগিল না। আর একটা—আর একটা—তৃতীয় চাবিতে কল ঘুরিয়া গেল।

কম্পিত হস্তে সতীশ বাবু বাক্স খুলিলেন। উপরের ডালায় কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার সেই ক্ষীণ বাতির আলোকেও ঝক্‌মক্

করিয়া উঠিল। ডালাটি নামাইয়া দেখিলেন, বাক্সের খোলটিও, নানাবিধ স্বর্ণাভরণে পরিপূর্ণ। হার, বাজু, ফুল, কাঁটা, চিরুনী বিছা, নথ, নেক্‌লেস, ব্রেসলেট, টায়রা প্রভৃতি—নানাবিধ অলঙ্কার। কোন কোন রকম দুই তিনটা করিয়া। দেখিয়া সরমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

সতীশ বাবু একে একে অলঙ্কারগুলি বাক্স হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। আতিপাতি করিয়া খুঁজিলেন, কোথাও প্রকৃত অধিকারীর নামগন্ধও নাই। তখন তিনি বাম হস্তে কপাল টিপিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সরমা গহনাগুলি একটি একটি করিয়া তুলিয়া আলোকে ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন—হাতে নাড়িয়া নাড়িয়া কোনটি কয় ভরির তাহা অনুমান করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আহা কার গয়না! হায় হায়!—একি অল্প গয়না! চার পাঁচ হাজার টাকার কম ত নয়! ওগো দেখ, একছড়া গিনিগাঁথা হার। এ সব কি বাঙ্গালীর? না মাড়োয়ারীর? বাঙ্গালীর মেয়ে গিনি-গাঁথা হার পরে নাকি?"

পাঁচ মিনিট এইরূপে কাটিলে সতীশ বাবু বলিলেন, "আমায় এক গ্লাস জল দাও ত।"

সরমা তখন বাক্স বন্ধ করিয়া, স্বামীকে এক গ্লাস জল আনিয়া দিলেন। তিনি জল পান করিলে তাঁহার হাত হইতে গ্লাস লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা তুমি বর্দ্ধমানে যখন শুনলে যে টাকা পাওয়া যাবে না, তখন তুমি কি করলে?"

"কি আর করব ? ষ্টেশনে এসে ট্রেণে উঠলাম।"

"তোমার মনে কি হচ্ছিল তখন ?"

"কন্যাদায় থেকে কি করে যে উদ্ধার হব, তাই ভাবতে লাগলাম ; আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগলাম।"

"আর কিছু ভেবেছিলে ?"

"আর কি ?"

"ভগবানকে ডেকেছিলে ?"

"তা—ডেকেছিলাম বৈকি।"

সরমা তখন উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "তবে আর সন্দেহ নেই। এ কারু বাক্স নয়—কেউ ফেলে যায়নি। তোমার মেয়ের বিয়ের জন্যে, ভগবানই তোমাকে এ দিয়েছেন।"

সরমার কথার স্বরে সতীশ বাবুর মনে হইল, কাব্য রচনা হিসাবে একথা সে বলিতেছে না—নিজের মনের সংশয়লেশহীন দৃঢ় বিশ্বাসের কথাই ব্যক্ত করিতেছে। স্ত্রীর এই নির্ব্বোধ সরল বিশ্বাসে সতীশের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সরমা বলিলেন, "কেন, তোমার কি বিশ্বাস হচ্চে না ?"

সতীশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা সে কথা ভেবে চিন্তে পরে দেখা যাবে। বাক্স এখন তুলে ফেল। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল যে। এখন শোয়া যাক্ এস।"

সরমা আলমারি খুলিয়া বাক্সটি অনেকগুলি কাপড়ের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়া, আলমারি বন্ধ করিলেন।

সে রাত্রি স্বামী স্ত্রী কেহই মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের পাতা বুজিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন সতীশ বাবুর আর অন্য চিন্তা রহিল না। গহনার বাক্সটি সম্বন্ধে কি করিবেন, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে দিন শেষ হইয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর, পুত্রকন্যাকে শয়ন করাইয়া সরমা স্বামীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "তা, তুমি অত ভাবছ কেন? ভেবে ভেবে যে একটা ব্যারাম জন্মে যাবে!"

সতীশ বলিলনে, "ভাবছি কি আর সাধে? এমন প্রলোভনে যে ঈশ্বর আমায় কেন ফেল্লেন তা বুঝতে পারছিনে।"

সরমা বলিলেন, "ঐ দেখ, ঈশ্বর মানবে, অথচ তাঁর দয়া মানবে না!—ঈশ্বর তোমার বিপদ দেখেই তোমাকে ও গহনার বাক্স দিয়েছেন—একথা তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না কেন?"

সে রাত্রেও কিছুই মীমাংসা হইল না। পরদিন প্রাতে উঠিয়া বিমলকে সতীশবাবু চৌমাথা হইতে কয়েকখানি ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র কিনিয়া আনিতে বলিলেন। প্রত্যেকখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিলেন, গহনা হারাণোর কথা সংবাদ-

স্তম্ভে কোথাও পাইলেন না, কেহ সে সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞাপনও দেয় নাই।

আরও দুইদিন কাটিল। এ দুইদিনও সতীশ বাবু সংবাদপত্র অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিলেন, কেহই গহনার বাক্স হারাণোর বিজ্ঞাপন দিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "অতগুলো টাকার গহনা হারালো, অথচ এ তিন চারদিনে কেউ টুঁশব্দটি পর্য্যন্ত করলে না।—তবে, সরমা যা বলেছে তাই কি সত্যি না কি?"

বেলা নয়টার সময় আপিস ঘরে বসিয়া গালে হাত দিয়া সতীশ বাবু খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন, এমন সময় ক্ষিতীশ আসিয়া উপস্থিত। সে ইঁহাকে দেখিবামাত্র বলিল, "এ কি মশায়, আপনার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছিল না কি?"

সতীশ বাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "না, অসুখ হয়নি। বস। বল, খবর কি?"

"জেঠামশায় এসেছেন।"

"কবে এলেন?"

"এই তিন চার দিন হল। বৌবাজারে রয়েছেন, সেইখানে তাঁর জন্যে বাড়ী ভাড়া করেছি কি না। তিনিই আমায় পাঠালেন। বল্লেন, সতীশ বাবুর সঙ্গে একবার দেখা হলে ভাল হত। আপনার মেয়েকে তিনি একদিন এসে দেখতে চান।"

"কবে?"

"সাহেবদের নববর্ষের ডালি সংগ্রহ করতে তিনি এখন ব্যস্ত

রয়েছেন। ১লা জানুয়ারির পর যেদিন আপনার সুবিধে হবে, সেইদিনই তিনি মেয়ে দেখতে আসবেন। আপনি যদি ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান, তবে সে দিনটাও অমনি স্থির করে আস্‌বেন।"

সতীশ বাবু রাস্তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া, সজল নেত্রে ক্ষিতীশের পানে ফিরিয়া বলিলেন, "বাবাজী, এ বিবাহ হবে না।"

ক্ষিতীশ অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কেন?"

"মহেন্দ্র বাবু যা চেয়েছেন, তা দেওয়া আমার সাধ্য হবে না।"

"কেন? এমন বেশী কিছু ত তিনি চান নি।"

সতীশ বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "ছেলের [illegible] আজকালকার বাজারে, [illegible] খুবই অল্প বটে,—কিন্তু সেই অল্পই আমার সাধ্যের বাইরে।"

ক্ষিতীশ বলিল, "বলেন কি?"

সতীশ বাবু নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ক্ষিতীশ বলিল, "এঃ—যে ভারি কেলেঙ্কারি হল মশায়! সমস্ত ঠিকঠাক—এখন বলছেন হবে না?"

সতীশ বলিলেন, "কি করি বল বাবাজী! মানুষ অবস্থার দাস। এক জায়গায় কিছু টাকা পাবার আশা ছিল, সেই আশার উপর নির্ভর করেই সম্বন্ধটি করেছিলাম। কিন্তু সেখানে নিরাশ হতে হয়েছে।"

"তা হলে, জেঠামশায়কে গিয়ে কি বলব?"

"বোলো, তিনি মহৎ, আমি গরীব, তিনি যেন আমার অপরাধ না নেন। তিনি যা চেয়েছিলেন, তা নিতান্ত সঙ্গত হলেও, আমার ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠলো না, তাই বাধ্য হয়ে আমাকে নিরস্ত হতে হল। তিনি অন্য পাত্রীর সন্ধান করুন।"

ক্ষিতীশ অনেকক্ষণ বিষণ্ণ মুখে মাটীর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। শেষে বলিল, "আচ্ছা সতীশ বাবু, আপনি কত হলে পারেন?"

সতীশ বলিলেন, "সে কথায় আর ফল কি বাবাজী? মহেন্দ্র বাবু মুঙ্গেরে আমায় বলেছিলেন, আমি এই যে দর দিলাম, এর একটি পয়সা কমে হবে না।"

ক্ষিতীশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভারি দুঃখের বিষয়।"

সতীশ বলিলেন, "[illegible] মহেন্দ্র বাবুকে তুমি বুঝিয়ে বোলো, আমি চেষ্টা যতদূর যা করবার তা করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই ঐ পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করে উঠতে পারলাম না।"

ক্ষিতীশ বলিল, "তার চেয়ে, সকল কথা খুলে আপনিই তাঁর নামে একখানা চিঠি লিখে দিন না কেন? সেই চিঠি তাঁকে আমি দেব।"

"ঠিক বলেছ। একটু বস তা হলে।"—বলিয়া সতীশবাবু উঠিয়া টেবিলের নিকট গিয়া বসিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন।

ক্ষিতীশকে বিদায় দিয়া সতীশ বাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীকে নিভৃতে ডাকিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন, "আমি মনস্থির করে ফেলেছি, সরমা।"

সরমা শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সতীশ বলিলেন, "প্রলোভনকে আমি জয় করেছি। সরমা, তোমার স্বামী গরীব—কিন্তু চোর নয়। আমি এইমাত্র বিবাহ ভঙ্গ করে মহেন্দ্র বাবুকে চিঠি লিখে দিয়ে এলাম। আজই ওবেলা কলকাতায় গিয়ে আমি ইংরেজি বাঙ্গলা খবরের কাগজে কাগজে গহনার বাক্স সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিয়ে আসব।"

সরমা বলিলেন, "কেউ যদি দাবী না করে?"

"তা হলে ও সমস্ত গহনা বিক্রী করে, কোনও অনাথ আশ্রম কিম্বা হাঁসপাতালে দান করব। আমার মেয়ের অদৃষ্টে যদি ভাল পাত্র থাকে, তবে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না সরমা, তুমি নিশ্চয় জেনো।"

সরমা বলিলেন, "আচ্ছা, সেই ভাল। তাই কর। বেলা হয়ে গেছে, এখন স্নান করে ফেল দেখি।"

বিকালে বাহির হইয়া, কাগজে কাগজে সতীশবাবু এই বিজ্ঞাপনটি ছাপিতে দিয়া আসিলেন—

গহনার বাক্স

কুড়াইয়া পাইয়াছি। কবে, কোথায় হারাইয়াছিল, বাক্সের রঙ ও গঠন, তাহাতে কি কি গহনা আছে যিনি বলিতে পারিবেন, তাঁহাকে ঐ বাক্স দেওয়া যাইবে। ১১নং পদ্মপুকুর রোড, খিদিরপুরে দাবীদার স্বয়ং আসিয়া অনুসন্ধান করুন।

উপর্য্যুপরি কয়েকরাত্রি অনিদ্রার পর, আজ সতীশ বাবু ঘুমাইয়া বাঁচিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটি শেষ হইয়া গেল। সতীশ বাবু কাছারি গিয়াছেন, বিমল স্কুলে গিয়াছে; সরমা আহারের পর ছাদে চুল শুকাইতেছেন ও সুপারি কাটিয়া কাটিয়া ডালাতে রাখিতেছেন। মনোরমা ঘরে বসিয়া কি পড়িতেছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া মাকে বলিল, "মা, আমাদের বাড়ীতে কে এসেছেন।"

"কোথা রে ?"

"ঐ যে সদরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কোচম্যান বলছে এই ত ১৭ নম্বর বাড়ী। একজন ঝি নেমেছে, রামটহলের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা কইচে।"

বলিতে বলিতে, নিম্ন হইতে অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল। ঝি-বেশধারিণী এক স্ত্রীলোক সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া সরমাকে দেখিয়া বলিল, "আপনিই কি এ বাড়ীর গিন্নী ?"

সরমা বলিলেন, "হ্যাঁ। কেন গা ? কোথা থেকে আসছ ?"

"আমরা কলকাতা থেকে আসছি গো। আমাদের গিন্নীমা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে এসেছেন।"

সরমা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কোথায় তিনি ? আসুন না।"

"আচ্ছা মা, নিয়ে আসি।"—বলিয়া ঝি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

সরমা বলিলেন, "মনো, যা ত মা, তোদের পড়ার ঘরে শত-রঞ্চিটে চট্ করে পেতে ফেল।"

এক মিনিট পরে, অনুমান চত্বারিংশৎ বর্ষবয়স্কা, সুবেশা কিন্তু প্রায় নিরাভরণা, স্থূলাঙ্গী কিন্তু সুন্দরী একটি মহিলা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিলেন। সরমা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আসুন।"

মহিলাটি সেইখানে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আসি। ক'টাই বা সিঁড়ি, এই উঠতেই হাঁপিয়ে পড়েছি। শরীলে আর পদত্থ নেই। চলুন।"—বলিয়া তিনি সরমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সরমা তাঁহাকে সেই শতরঞ্জে বসাইয়া, নিজে নিকটে বসিলেন।

মহিলাটি তখনও হাঁফাইতেছেন। একটু সুস্থ হইয়া, মনো-রমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওটি কে? তোমার মেয়ে? ঐ দেখ, তোমায় তুমি বলে ফেল্লাম। তা ফেল্লামই না হয়, কি বল? তুমি ত দেখছি, বয়সে আমার চেয়ে ছোটই হবে। তুমি বউ মানুষ আমি গিন্নীবান্নী—তুমি বলায় কোনও দোষ আছে?"

সরমা হাসিয়া বলিলেন, "না, কিচ্ছু না।"

"তোমার কত বয়স হয়েছে, তিরিশ?"

"না, আটাশ।"

"আটাশ? তাই হবে। আমার বোধ হয় বত্রিশ কি তেত্রিশ। আচ্ছা, এর বেশী বলে মনে হয় কি? আমার প্রথম ছেলে অবিনাশ যখন কোলে হল, তখন আমার বয়স চৌদ্দ—এই চৌদ্দ পেরিয়ে, সবে পনেরোয় পা দিয়েছি। সে ছেলে আমার আজ

ষেঠের চব্বিশ বছরের, এই কার্ত্তিকে তার জন্মমাস গেছে। গেল বছর তার বিয়ে দিয়েছি। বউটি ডাগর সাগর কি না, এই ভাদ্র মাসে তার একটি ছেলেও হয়েছে। বলতে নেই তোমাদের কল্যাণে ছেলেটি হয়েছে যেন রাজপুত্তুর। এখন বাঁচে, তবেই। তা, অবিনাশ যখন আমার কোলে, তখন যদি আমার বয়স পনেরো হয়, তবে দেখ না হিসেব করে আমার বয়স এখন কত? বত্রিশ তেত্রিশের বেশী হবে কি?"

হাসি চাপিয়া রাখা সরমার পক্ষে কষ্টকর হইতেছিল। যথা-সাধ্য সংযম অবলম্বন করিয়া তিনি বলিলেন, "না, এমনই কি বেশী?—তা, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?"

"বলি। হ্যাঁগা, তোমাদের পাণ বেশী সাজা আছে? থাকে ত দাও না দুটো—আমি বড্ড পাণ খাই। আমি ত কী পাণ খাই—আমার মেঝ যা, সে বাঁকীপুরে থাকে তার স্বামী মুন্সোব—সে যা পাণ খায়—আমার দেওর বলে কি, পাণ খেয়ে খেয়েই বউ আমায় ফেল করবে। এক ডিপে পাণ আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম, তা গাড়ীতেই ফুরিয়ে গেল। অনেকটা পথ! এই যে পাণ এনেছ দেখছি—ওঃ এ যে অনেক! আচ্ছা দুটো খাই। এই মরেছি! জর্দ্দার কৌটোটা বুঝি গাড়ীতেই ফেলে এলাম! ঝি, যা ত মা, ছুটে গিয়ে কৌটোটা নিয়ে আয় ত। এমনি বদ্ অভ্যেস হয়ে গেছে, জর্দ্দা না হলে পাণ আবার মুখে রোচে না। তুমি জর্দ্দা খাও?"

সরমা বলিল, "না, কখনও ত খাইনি।"

"আচ্ছা, আসুক আমার কৌটো—খেয়ে দেখো একটু; গয়া থেকে আমার স্বামী কি মাসে ভি'প করে আনান। জর্দ্দা টর্দ্দা খাওয়া যদি কখনও অভ্যেস কর ত বলে রাখছি, গয়ার জর্দ্দা আনিয়ে খেয়ো। অমন জর্দ্দা আর কোথাও পাবে না। লক্ষ্ণৌ খেয়েছি, কাশী খেয়েছি—আমার ত আর খেতে বাকী নেই কিছু! কিন্তু গয়ার তুল্য জর্দ্দা খেলাম না আজ অবধি। কেউ কেউ বলে বটে যে লক্ষ্ণৌয়ের জর্দ্দা খুব ভাল। শুনোনা ও সব কথা। ছাই—ছাই। গয়াতে ১৬৲ টাকা সের যে জর্দ্দা পাওয়া যায়, তার কাছে লক্ষ্ণৌয়ের ৮০৲ সের দাঁড়াতে পারে না—এ কথা আদালতে গিয়ে জজের সামনে আমি বলতে পারি। গয়ার চামারী সার দোকান থেকে আনিও, ১৬৲ সের। আমি তাই খাই। ৩২৲ সের আছে, ৬৪৲ সের আছে। আমাদের হল নিত্যি খাওয়া, রোজ রোজ কি অত দামের জর্দ্দা খাওয়া পোষায়? ১৬৲ টাকাই খাই। এত হিসেব করে চলি, তবু আমার স্বামী আমায় বলেন উড়নচণ্ডী। তাঁর মত কেপ্পণ না হলেই মানুষ বুঝি উড়নচণ্ডী হয়? আমাকে বে-হিসেবী, উড়নচণ্ডী, কত কি বলেন! তা, তিনি স্বামী, গুরুজন, বলুন যা ইচ্ছে হয়; সে জন্যে কে আর তাঁর নামে মোকর্দ্দমা করতে যাচ্ছে—কি বল ভাই অ্যাঁ? এই এই যে ঝি, এনেছিস?—দে।" বলি কৌটা খুলিয়া কিঞ্চিৎ জর্দ্দা আলগোছে মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন।

তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী কোথায় কায করেন?"

সরমা বলিলেন, "আলিপুর আদালতে।"

"কি কায করেন ? নাজির, না সেরেস্তাদার ? —না, নাজির সেরেস্তাদার নন—তা হলে তোমার গায়ে অনেক গহনা থাকত। আমার স্বামী বলেন, নাজির সেরেস্তাদারেরা খুব বড়লোক। তিনি হাকিম কিনা। বলেন, আমার পৈত্রিক আমলের যোড়া দুই শাল আছে, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ হলে তাই গায়ে দিয়ে যাই; কিন্তু আমার নাজির সেরেস্তাদারেরা দেখি এক দিন সবুজ শাল গায়ে দিয়ে আসে, একদিন নীল শাল, এক দিন বাদামী, একদিন নেবু রঙের —তাদের বাপ পিতামহ ক যোড়া শালই রেখে গেছে কে জানে!—হুঁা, কি বলছিলাম ভুলে গেলাম। তোমার স্বামী কি কায করেন বল্লে ?"

"উকীল।"

"উকীল ? ওঃ—তা বেশ। উকিলী কাযও বেশ ভাল। ঢের পয়সা। আমি জানি কি না, আমার স্বামীর এজলাসে অনেক উকীল কায করে—আমাদের বাড়ীতেও আসে। কারু ফী দশ, কারু বিশ, কারু পঞ্চাশ, কারু একশো—উকীলদের ঢের পয়সা। তবে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট, একটু টানাটানি যায়। তোমার স্বামী বোধ হয় এখন ও তত পুরোণো হন নি, নয় ভাই ?"

"না।—আপনি কোথায় থাকেন ?"

"কোথায় থাকি ? সে ভাই অনেক কথা। ঝি, তুই যা ত মা, নীচে গিয়ে বসগে। দোরটা ভেজিয়ে দাও—বলি। কথাটা ভারি গোপনীয়।"

মনোরমা মার পানে চাহিল। সরমা বলিলেন, "দোরটা টেনে দিয়ে তুমি ও ঘরে গিয়ে বসগে মা।"

মনোরমা চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কক্ষ নির্জ্জন হইবামাত্র মহিলাটি নিম্নস্বরে বলিলেন, "আমি যে কে, কোথায় থাকি, কি বৃত্তান্ত সে সব কিছু তুমি জিজ্ঞাসা করতে পাবে না ভাই, তা বলে রাখছি কিন্তু। কথাটা রটে গেলে আমার ভয়ানক মুস্কিল হবে।"—প্রায় অর্দ্ধমিনিট কাল নীরবে কি ভাবিয়া, শেষে আঁচলের গিরো খুলিয়া তিনি এক টুকরা কাগজ বাহির করিলেন। কাগজখানি সরমার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, এই বিজ্ঞাপন কি তোমরা দিয়েছ?"

সরমা পড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার স্বামী দিয়েছেন।"

"বাক্স আছে তোমাদের ঘরে?"

"আছে।"

"কালো রঙের ক্যাশ বাক্স, ডালাটার চারিধারে সোণালী আঁজি কাটা, সবুজ বনাতের ঘেরা-টোপ দেওয়া?"

"হ্যাঁ।"

হস্তসঙ্কেতে দেখাইয়া বলিলেন, "এই—এতখানি বাক্সটা হবে।"

"হ্যাঁ।"

শুনিয়া তাঁহার মুখটি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "আঃ—বাঁচালে। আমারই বাক্স। আমিই বাক্স হারিয়েছি। হারিয়ে অবধি আমার মন এমন খারাপ ভাই—কাউকে বলিনি, আমার স্বামীকেও নয়। ভয়ে মরি! মুখে ভাত যায় না জল যায় না। তিনি ভারী কেপ্পণ আর ভারী রাগী কিনা—শুন্‌লে অনর্থ করতেন। এক আধ টাকার নয়, পাঁচ হাজার টাকার গহনা, সোজা কথা! একেই ত তিনি আমায় যখন তখন বলেন উড়ন-চণ্ডী! ভালয় ভালয় যে পাওয়া গেল, এই মঙ্গল। আজ সকালেই কাগজে আমি এই বিজ্ঞাপন দেখেছি। দেখে, বোনঝির বাড়ী যাবার নাম করে এখানে ছুটে এসেছি।—আমার বাক্স তবে আমায় দাও।"

সরমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তিনি বাড়ী না এ'লে—"

"কখন আসবেন?"

"সন্ধ্যার সময়।"

মহিলাটি চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "তবেই ত মুষ্কিল! ততক্ষণ কি থাকৃতে পারব? না—পারব না। আমার বোনঝির বাড়ী আমায় আনতে তারা যদি দরোয়ান টরোয়ান পাঠায়, তা হলেই চিত্তির আর কি!"

সরমা বলিলেন,"কাল একবার আপনি আসতে পারবেন না?"

মহিলাটি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তা পারবো না কেন? পারবো।"

"তা হলে দয়া করে, আপনার বাক্স কবে কোথায় কেমন করে হারালো, আর তাতে কোন্ কোন্ গহনা ছিল আমায় বলে যান ; তিনি এলে তাঁকে আমি বলব।"

মহিলাটি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, 'আচ্ছা সব বলি তা হলে শোন। আমরা থাকি পশ্চিমের একটা সহরে। নামটা নাইবা শুনলে! আমার স্বামী সেখানকার হাকিম। ডেপুটি কি মুন্সেব কি সবজজ—সেটা আর নাই বল্লাম। আমার মেঝ ছেলে, সে এখানে কলেজে পড়ে। একজন উকীল—কোথাকার উকীল সেটা আর নাই বল্লাম—তার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল। বেচারী গরীব—গিয়েছিল মুং—আমাদের বাড়ী। কর্ত্তা দর যা হাঁকলেন, তাই শুনেই তার চক্ষু চড়কগাছ! সে মেয়েকে দেখে আমার ছেলের নাকি ভারি পছন্দ হয়েছিল, তাই কর্ত্তাকে আমি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, দেড় হাজার টাকার গহনা, দান সামগ্রী বরাভরণ পাঁচশো টাকার, নগদ পাঁচশো টাকা—এই আড়াই হাজারে রাজি করলাম। বাবুটিও স্বীকার হলেন। কর্ত্তা একমাসের ছুটি নিলেন, কলকাতায় বাড়ী ভাড়া হল, আমরা সবাই কল্‌কাতায় আস্‌ছি। ডাক গাড়ীতে রিজাভ পাওয়া গেলনা, প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে রিজাভ হল। সেই ভোরবেলা গাড়ী চড়েছিলাম, সারাদিন গেল, রাত একটার সময় হাওড়ায় এসে পৌছলাম। গহনার বাক্সটি আমার হাতে, কর্ত্তার হাতে তাঁর কুরিয়ার ব্যাগ, কুলিদের মাথায় জিনিষপত্র দিয়ে—"

সরমা এই সময় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে ? কোন দিন আপনারা হাওড়ায় এসে পৌছলেন মনে আছে ?"

মহিলাটি বলিলেন, "ঐ যেদিন কাছারি বন্ধ হল, তার পরদিন গো ; বড়দিনের আগের দিন আর কি। কুলিদে. মাথায় জিনিষ পত্র দিয়ে, ঠিকে গাড়ী যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে এলাম। কেউ হাঁকে দু'টাকা, কেউ হাঁকে সাত সিকে, কেউ চায় দেড় টাকা—তা কর্ত্তা বল্লেন, এক টাকার এক পয়সা বেশী দিচ্ছিনে—যাবি ত চল্। শেষে পাঁচসিকেয় একখানা গাড়ী ঠিক হল। জিনিষপত্র কুলিরা গাড়ীর ছাদে তুলতে লাগল, আমি গহনার বাক্সটি গাড়ীর ভিতর রাখলাম। বিষম ভারি—হাত ভেরে গিয়েছিল। উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় আর এক গাড়োয়ান এসে বল্লে, আমার আঠারো আনা দেবেন বাবু। কর্ত্তা বল্লেন—আঠারো আনায় যাবি ? তবে চল তোর গাড়ীতেই যাই। গাড়োয়ানে গাড়োয়ানে বেধে গেল বিষম ঝগড়া।—এই মারে ত এই মারে। দেখে ত আমি ভয়ে মরি—ফৌজদুরী দাঙ্গাই বুঝি দাঁড়ায়! কর্ত্তা বল্লেন—চলো কুলিলোগ, মাল উতারো—কেয়া দেখতা ?—আমার হাত ধরে বল্লেন—এস। তাঁর সঙ্গে গেলাম ; এমনি মনিষ্যি, গহনার বাক্সটি যে সেই আগেকার গাড়ীতেই পড়ে রইল তা আমার হুঁসই হল না।"

সরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ছেলের বিয়ে কবে হবে ?"

মহিলাটি বলিলেন, "কবে হবে তা ত জানিনে ভাই। সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে। সবই ঠিকঠাক ছিল—কিন্তু এই পশু না

তম্ব´, মেয়ের বাপ ওঁকে চিঠি লিখেছে—অতটাকা দেবার আমার ক্ষমতা নেই, ছেলের আপনি অন্য সম্বন্ধ করুন। সেই শুনে অবধি বাছা আমার মুখটি চুণ করে বেড়াচ্চে—মেয়েটিকে ভারি তার পছন্দ হয়েছিল কি না! আরও দু'তিন জায়গায় কথাবর্ত্তা চলছে—কিন্তু মেয়েগুলি তেমন সুন্দর নয় তাই মন সরছে না। দেখি, ভাল মেয়ে একটি পাই যদি।—অনেক দেরী হয়ে গেল, এখন তবে উঠি ভাই। তোমার স্বামীকে সব কথা বোলো। কাল আবার আমি এসে বাক্স নিয়ে যাব।"

"আচ্ছা, আপনি একটু বসুন"—বলিয়া সরমা উঠিয়া গেলেন। দুই মিনিট পরে ঘেরাটোপ শুদ্ধ বাক্সটি আনিয়া, মহিলাটির সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "এই নিন আপনার বাক্স। দেখুন, এই বাক্সই আপনার ত?"

"এই ত!"—বলিয়া তিনি অঞ্চল হইতে চাবি লইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বাক্স খুলিয়া ফেলিলেন।

সরমা বলিলেন, "দেখে নিন, আপনার সব জিনিস ঠিক ঠিক আছে ত?"

তিনি গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা! তুমি যে অবাক্ কল্লে ভাই! তোমরা কি সেই মানুষ যে আমার জিনিষ তছরূপ করবে? তা যদি হত—তাহলে ত সবই নিতে পারতে; বিজ্ঞাপন দিতে যাবে কেন? তা ভাই, আমায় যে বাক্স নিয়ে যেতে বলছ, তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করবে না? গহনার লিষ্টিও আমি এখনও তোমায় বলিনি!"

সরমা বলিল, "আর কিছু দরকার নেই। আমি আপনাকে চিন্‌তে পেরেছি।"

"চিন্‌তে পেরেছ? কে আমি বল দেখি?"

"আপনি মুঙ্গেরের সবজজ মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী। যে ছেলের বিয়ের জন্যে এসেছেন, তার নাম শচীন্।"

মহিলাটি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সরমার মুখ পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "তুমি কে?"

সরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "যার মেয়ের সঙ্গে আপনার ছেলের সম্বন্ধ হচ্ছিল, সেই আমি। ঐ বড়দিনের আগের দিন উনি বর্দ্ধমানে গিয়েছিলেন—এক জায়গায় হাজার খানেক টাকা পাবার কথা ছিল, সেই টাকা আনতে। টাকা পাওয়া গেল না। রাত একটার সময় ঐ ট্রেণে বর্দ্ধমান থেকে উনি ফিরলেন। ঘোড়া-গাড়ী করে বাড়ী এলেন। বাক্স আগে উনি গাড়ীতে দেখেন নি। বাড়ী এসে পৌঁছে, চাকর গাড়ী থেকে অন্য জিনিষপত্রের সঙ্গে ঐ বাক্সও নামিয়ে এনেছিল, উনি ত দেখে অবাক!"

মহিলাটি গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন। শেষে বলিলেন, "তুমিই মেয়ের মা?"

সরমা বিষণ্ণ মুখে হাসিয়া বলিলেন, "আমিই মেয়ের মা।"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বর্দ্ধমানে ঐ হাজার টাকা পাওয়া গেল না বলেই কি বিয়ে ভেঙ্গে গেল?"

"হ্যাঁ।"

"একটি হাজার টাকার জন্যে? হায় হায়। খাসা মেয়েটি

তোমার ভাই। এখন তবে বলি, ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল—আহা এমনি একটি বউ আমার হয়!"

সরমা অবনত মস্তকে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন। শেষে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তা, ওকেই কেন আপনার বউ করুন না? আপনারই ত হাতে!"

মহিলাটি বলিলেন, "পোড়াকপাল!—আমার হাতে হলে কি আর ভাবনা ছিল? আচ্ছা—তোমার মেয়েকে একবার ডাক ত ভাই।"

সরমা কন্যাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "এঁকে প্রণাম কর।"

মনোরমা প্রণাম করিলে, সবজজ্ গৃহিনী কাছে বসাইয়া, সস্নেহে তাহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে পাণ ও জর্দ্দা খাইয়া, উঠিলেন। সরমাকে বলিলেন, "আজ তা হলে উঠি ভাই। বাক্স নিয়ে চল্লাম। কাল কি পশু আবার আমি আসব।"—বলিয়া তিনি বিদায়গ্রহণ করিলেন।

পরদিনই তিনি আবার আসিয়া উপস্থিত। সিঁড়ি উঠিবার ক্লান্তি লাঘব হইলে, সরমাকে নিভৃতে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "আমার স্বামীকে অনেক বলে কয়ে দেখ্‌লাম, তিনি একটি পয়সাও কমাতে চান না। এমন কেপ্পণ দেখনি ভাই! এ কি কম আপশোষ যে হাজার টাকার জন্যে এমন বউটি আমি হারাব? তাই, ও টাকাটা আমি সঙ্গে করেই এনেছি—এই নাও ক'খানা নোট। আমার টাকা তুমি আমাকেই দেবে; তুমি

ত আর নিচ্চ না! তুমি মনে কিছু 'কিন্তু' কোর না ভাই।" তোমার স্বামীকে বোলো, কালই যেন আমাদের ওখানে গিয়ে একবারে পাকাপাকি বিয়ের দিনস্থির করে আসেন। কিন্তু ভাই একটা কথা বলি—সাবধান সাবধান—আমি যে এই নোট দিয়ে যাচ্ছি, কাগে কোকিলেও যেন টের না পায়। আমার স্বামী শুনলে অনর্থ করবেন, একেবারে ক্ষেপে যাবেন! একেই ত আমায় যখন তখন বলেন উড়নচণ্ডী! হ্যাঁ ভাই, আমি উড়নচণ্ডী?"—বলিয়া মনোরমার হাতে তিনি নোটের গোছা দিলেন।

"না—আপনি লক্ষ্মী—আপনি কমলা"—বলিয়া সরমা সজল নয়নে সবজজ্ গৃহিণীর পদধূলি লইলেন।

আর্দ্রতত্ত্ব

দানাপুর ষ্টেশনের অনতিদূরে, ইংরাজ টোলায়, লাল টালি আচ্ছাদিত লম্বা ধরণের একখানি একতালা পাকা বাড়ী। ইহা রেলওয়ে গার্ডগণের জন্ম নির্ম্মিত 'রেষ্ট হাউস' বা বিশ্রামগৃহ। সারি সারি অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ—সম্মুখে ও পশ্চাতে লম্বা টানা বারান্দা। বাড়ীটির পশ্চাদ্ভাগে, দেশী খোলার ছাপ্পরযুক্ত কয়েকখানি ঘর—তাহার মধ্যে একটা বাবুর্চিখানা, অপর কয়েকখানি ভৃত্যগণের অবস্থান জন্ম। সম্মুখভাগে খানিকটা খোলা জমির উপর ফুলের বাগান। দুইটি বড় বড় কৃষ্ণচূড়ার গাছ সর্ব্বাঙ্গে ফুল ফুটাইয়া বাতাসে দুলিতেছে; বাকীগুলির অধিকাংশই বিলাতী ফুলের ছোট গাছ, দুই একটি দেশী ফুলও আছে।

আষাঢ় মাস। আকাশে মেঘ করিয়া রহিয়াছে। সম্মুখের বারান্দায় লোহার খাটে নেটের মশারির মধ্যে গার্ড ডিসুজা সাহেব নিদ্রিত। মাঝে মাঝে ফুরফুরে হাওয়ায় সে মশারি কাঁপিয়া উঠিতেছে। রাত্রি দুইটার সময় মোগলসরাই হইতে ২৬ নং মালগাড়ী লইয়া ডিসুজা সাহেব দানাপুরে আসিয়াছিলেন। অদ্য বেলা ১০ টায় আবার ১৫ নং লোকাল প্যাসেঞ্জার লইয়া তাঁহাকে মোগলসরাই ফিরিতে হইবে।

বেলা ৮ টা বাজিল। রৌদ্র নাই, তাই বেলা বুঝা যাইতেছে না। বাঙ্গলার খানসামা নগ্নপদে ধীরে ধীরে আসিয়া সাহেবের

শয্যার নিকট দাঁড়াইল। লাল ডোরাকাটা কাণপুর টুইলের পায়জামা-সুট পরিয়া সাহেব গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কোটের বুকের অধিকাংশ বোতামই খোলা। খানসামা ডাকিল, "হুজুর।"

হুজুরের সাড়া নাই।

খানসামা আবার ডাকিল, "আঠ্ বাজ গিয়া সাহেব—জাগিয়ে।"

অবশেষে খানসামা মশারির ভিতর হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, সাহেবের হাঁটু ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "জাগিয়ে হুজুর। আঠ্ বাজ গিয়া।"

সাহেব তখন উঃ করিয়া চক্ষু খুলিলেন। একটি হাই তুলিয়া, বালিসের নীচে হইতে নিজ বৃহদাকার সরকারী ওয়াচটি বাহির করিয়া দেখিলেন, আটটা বাজিয়া বারো মিনিট।

সাহেব বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "...সল ঠিক করো।"

"ঠিক হায় হুজুর"—বলিয়া খানসামা চলিয়া গেল।

সাহেব শয্যা হইতে নামিয়া, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হুক্ হইতে ঝুলানো নিজ কোটের পকেট হইতে পাইপ, দেশলাই ও তামাকের পাউচ্ বাহির করিয়া লইলেন। ভিতরের বুক পকেটে একখানি চিঠি ছিল, তাহাও বাহির করিলেন।

একখানি ঈজি চেয়ারে বসিয়া, পাইপ ধরাইয়া, পত্রখানি খুলিয়া সাহেব পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি মোজঃফরপুর ষ্টেশন মাষ্টারের কন্যা, কুমারী বার্থা ক্যাম্বেল কর্ত্তৃক লিখিত। বার্থার সহিত ডিসুজা সাহেব বিগত এপ্রিল মাস হইতে বিবাহপণে আবদ্ধ।

অক্টোবর মাসে ডিসুজা সাহেবের একমাস ছুটি 'ডিউ' হইবে—ছুটি হইলেই বিবাহ, ও সিমলা শৈলে গিয়া মধুচন্দ্র-যাপন স্থির হইয়া আছে।

পত্রখানি আজ তিনদিন হইতে সাহেবের পকেটে পকেটে ঘুরিতেছে। ফেরৎ ডাকে উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ ছিল, তাহা হইয়া উঠে নাই—আজ উত্তর দিয়া পত্রখানি ডাকে ফেলিতেই হইবে।

পাইপ শেষ করিয়া, ক্ষৌরকার্য্য ও স্নানাদি অন্তে সাহেব যখন বাহির হইলেন তখন ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। মোকামা-মোগলসরাই লোক্যাল খানি ঠিক সাড়ে নয়টার সময় দানপুরে পৌঁছিবে। সেই সময় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া, ট্রেণের চার্য্য বুঝিয়া লইতে হইবে—সুতরাং পত্র লেখার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সাহেব "হাজরি" আনিবার হুকুম করিলেন। পত্রলেখার সময় হইল না বলিয়া সাহেবের মনটা কিছু অপ্রসন্ন, তাঁহার মুখভাব হইতে স্পষ্টই ইহা বুঝা যাইতেছিল।

খাদ্যদ্রব্যের প্রথম কিস্তি টেবিলে আসিল। দুইখানি টোষ্ট, মাখন ও চা। দুইটি "আণ্ডা বাইল" ছিল—সাহেব প্রথম ডিম্বটি ভাঙ্গিয়া দেখিলেন—পচা। তাহা সরাইয়া রাখিয়া, দ্বিতীয়টি ভাঙ্গিয়া, মাখন ও টোষ্ট সহযোগে ভক্ষণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঔর ক্যা হায় ?"

খানসামা উত্তর করিল, "মটন চাঁপ হায়, ঠান্‌ঢা রোস হায়, কারি-ভাত হায়।"—বলিতে বলিতে খানসামার সহকারী একটি ঢাকা পাত্রে মটন চপ্‌ আনিয়া টেবিলে রাখিল।

সাহেব ৩।৪ খানি চপ্ প্লেটে তুলিয়া লইয়া, ছুরি দিয়া কাটিয়া মুখে তুলিলেন। খানিক চর্ব্বণ করিয়া বলিলেন, "বহুৎ কড়া হায়, মটন নেহি হায়।"

খানসামা বলিল, "গোট্-মটন হায় হুজুর—আসল মটন আজ মিলা নেহি।"

সাহেব দ্বিতীয় একখানি চপ্ কাটিয়া, চর্ব্বণ করিবার বৃথা চেষ্টার পর রাগিয়া বলিলেন, "লে যাও। ফেঁক দেও। কুত্তাকো মৎ দেও—উস্কা দাঁত টুট যায়েগা।"

খানসামা প্লেট উঠাইয়া লইয়া সহকারীকে বলিল, "রোস লাও—কারি ভাত লাও—জল্‌দি।"

গত রাত্রে রোষ্ট করা লেগ্-অব্-মটনের কিয়দংশ ছিল, তাহা হইতে টুকরা দুই কাটিয়া সাহেব ভক্ষণ করিলেন—ভাল লাগিল না।

সাহেব তখন কারি-ভাত চাহিলেন। মুর্গীর কারি—পাত্র হইতে হুহু করিয়া ধোঁয়া উঠিতেছে। প্লেটে লইয়া মুখে দিয়া দেখিলেন, চর্ব্বণ করা তাঁহার কর্ম্ম নয়।

সাহেব গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "ক্যা হুয়া!—ইয়ে ক্যা হায়! ইউ ড্যাম উল্লুকা বাচ্চা, হাম তুমারা উপর রিপোর্ট কর দেঙ্গে—সী ইফ্ আই ডোণ্ট"—বলিয়া কাঁটা চামচ ফেলিয়া সাহেব উঠিয়া পড়িলেন। ঘড়ি দেখিলেন—নয়টা বাজিয়া সাতাস মিনিট। হ্যাট লইয়া বাহির হইয়া দ্রুতপদে ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

যথাসময়ে ট্রেণ দানপুর ছাড়িল। খান পাঁচ ছয় আরোহীগাড়ী

বাকী সমস্তই মাল বোঝাই ওয়াগন। প্রত্যেক ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, সন্ধ্যা নাগাদ গাড়ী মোগলসরাই পৌঁছিবে।

গোটা দুই তিন ষ্টেশন পার হইলে, ডিসুজা ক্ষুধার তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ট্রেণের চার্য্য লইবার সময় সে দেখিয়াছিল, ব্রেকভ্যানে মেঝে হইতে গাড়ীর ছাদ পর্য্যন্ত আমের ঝুড়ি বোঝাই করা আছে। এ সময় দ্বারভাঙ্গা অঞ্চল হইতে বিস্তর আম চারিদিকে চালান যাইয়া থাকে। সাহেব ভাবিল, গোটা কতক আম বাহির করিয়া ততক্ষণ খাওয়া যাউক।

এই ভাবিয়া সাহেব ব্রেকভ্যানের দ্বার খুলিল। পক্ক ফলের লোভনীয় সুমিষ্ট গন্ধ ক্ষুধার্ত্তের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

সামনেই একটা বৃহৎ ঝুড়ি—মুখটার উপর আচ্ছাদনখণ্ড দড়ি দিয়া সেলাই করা, সেলায়ের ফাঁক দিয়া দিয়া কালো কালো আমপাতা উঁকি দিতেছে। ডিসুজা পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া, সেলাই কাটিয়া, ভিতরে হাত ভরিয়া দিল। প্রথমটা কেবল পাতা, আরও নিম্নে হাত ঢুকাইয়া ডিসুজা একটি আম বাহির করিল। দেখিল, বৃহদাকার উৎকৃষ্ট ল্যাংড়া। আরও একটা আম বাহির করিয়া, ব্রেকভ্যানের দ্বার বন্ধ করিয়া স্বস্থানে আসিয়া বাক্স হইতে একখানি প্লেট বাহির করিল। সাহেব আম দুইটিকে সোরাইয়ের জলে উত্তমরূপে ধৌত করিল। তাহার পর আম দুইটি কাটিয়া, পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন আরম্ভ করিল।

ভোজন অর্দ্ধ শেষ হইতেই, গাড়ী আসিয়া কৈলোয়ার ষ্টেশনে দাঁড়াইল। ষ্টেশন মাষ্টার রামতারণ মিত্র ধুতির উপর ছেঁড়া

চাপকান পরিয়া 'গাড়ী পাস' করিতে আসিয়াছেন। ব্রেকভ্যানে আসিয়া বলিলেন, "গুড্ মর্ণিং মিষ্টার ডিসুজা—কিছু পার্শেল টার্শেল নামিবে না কি ?"

সাহেব আম খাইতে খাইতে বলিল, "কুছ্ না।"

"বাঃ—বেশ আম ত! খাসা গন্ধ বেরিয়েছে—পার্শেলের আম বুঝি ?"

সাহেব শিরশ্চালনা করিয়া বলিল, "খাইবে ?"

"দাও না সাহেব।"—বলিতে বলিতে রামতরণ বাবু ব্রেক-ভ্যানে উঠিলেন।

সাহেব বলিল, "দরজা খোল। ঐ—ঐ সামনের বাস্কেট হইতে দুইটা লও।"

রামতরণ বাবু ঝুড়ির আবরণ চাড়া দিয়া তুলিয়া ধরিয়া, এ পকেটে দুইটা ও পকেটে দুইটা এবং হাতে দুইটা আম লইয়া বাহির হইলেন।

সাহেব বলিল, "পাণ আছে ?"

"আছে বৈ কি"—বলিয়া বাবু পকেট হইতে ডিবা বাহির করিয়া, দুইটি পাণ সাহেবের "ভ্যানবুক" নামক বহিখানির উপর রাখিয়া দিলেন। নামিয়া, ঘণ্টা দিতে বলিলেন—গাড়ী ছাড়িল।

সাহেব হাত ধুইয়া, ড্রাইভারকে সবুজ ঝাণ্ডী দেখাইয়া পাণ দুইটি খাইতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহার মনে হইল, ক্ষুধা এখনও ভাঙ্গে নাই, আর গোটা দুই আম খাইলে মন্দ হইত না। যেমন ভাবনা—কার্য্যও সেইরূপ। আহারান্তে মুখ হাত

ধুইয়া পাণ খাইতে খাইতে, গাড়ী আরা ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল।

আরা অপেক্ষাকৃত বড় ষ্টেশন—ষ্টেশন মাষ্টার গাড়ী পাস করিতে আসেন নাই—আসিয়াছেন জেনারেল এসিট্যাণ্ট। বাবুটির বয়স হইয়াছে, চোখে রূপার ফ্রেমযুক্ত চশমা। ব্রেকভ্যানে উঠিয়া বলিলেন, "হ্যালো মিষ্টার ডিসুজা—ম্যাঙ্গো স্মেলিং—বিউটিফুল্।"

সাহেব হাসিয়া বলিল, "ফাইন ল্যাংড়াজ্। খাইবে ?"

"দাওনা সাহেব গোটা কতক।"

ডিসুজা সেই ঝুড়ি হইতে গোটা চারি আম বাহির করিয়া বাবুটিকে দিল। ব্রেকভ্যান বন্ধ করিয়া ষ্টেশনের আপিসে গেল—এখানে কয়েকখানা মালগাড়ী কাটিতেছে—দেরী হইবে। ষ্টেশন মাষ্টার তখন বাড়ীতে, আহারান্তে নিদ্রাগত। তাঁহার পুত্র চারু ও কন্যা কমলা সেখানে খেলা করিতেছিল। জেনারেল বাবুর হাতে আম দেখিয়া এবং তাহা ডিসুজা সাহেব দিয়াছে শুনিয়া, চারু ও কমলা বাহানা ধরিয়া বসিল, "সাহেব, আমরাও আম খাব।"—বলিয়া তাহারা সাহেবের হাঁটু ধরিয়া লাফাইতে লাগিল।

সাহেব বলিল, "আচ্ছা, তুমিরা হামার জন্যে পাণ লইয়া আসে। হামি আম দিবে।"

চারু ও কমলা ডিসুজা সাহেবের জন্য পাণ আনিতে ছুটিল। তাহারা ইহাকে "পাণখেকো সাহেব" বলিত। পূর্ব্বেও কতবার সাহেবকে পাণ আনিয়া দিয়াছে।

পাণ লইয়া, সাহেব ইহাদিগকে ব্রেকভ্যানে লইয়া গিয়া, স্বহস্তে

ঝুড়ি হইতে বাহির করিয়া আম দিল। ইহারাও "আরও দাও—আরও দাও" করিয়া, কোঁচড় ও অঞ্চল ভরিয়া আম লইয়া, আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া গেল।

এইরূপে প্রতি ষ্টেশনে "দাতব্য" করিতে করিতে, এবং মাঝে মাঝে খাইতে খাইতে, বেলা ৫টা নাগাইদ্ ঝুড়িটি প্রায় খালি হইয়া গেল। সকলডিহার ষ্টেশন মাষ্টারকে ঝুড়ির ইতিহাস বলিতে বলিতে দুইটি আম দিবার সময় ডিসুজা দেখিল, বড় জোর আর গুটি ১৫।১৬ আম নিম্নে পড়িয়া আছে। ষ্টেশন মাষ্টার বাবু বলিলেন, "তা সাহেব, দিলে দিলে, একটা ঝুড়ি থেকেই সব দিলে কেন? এত ঝুড়ি ত রয়েছে। ভাগাভাগি করে নিলেই ত হ'ত!"

সাহেব বলিল, "এ আমগুলি খুব চমৎকার যে! অন্য ঝুড়ির আম কেমন হইত তাহার ঠিক কি?"

বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে।—আর, পাঁচজনের অভিশাপ কুড়ানোর চেয়ে, একজনের অভিশাপই ভাল।"

সাহেব বলিল, "ঝুড়িটা একেবারেই খালি হইয়া গেল। এই খালাসী—লাইন সে থোড়া পাথল উঠাও ত।"

খালাসী পাথর উঠাইয়া ব্রেকভ্যানের উপর রাখিতে লাগিল। অনেকগুলা জমিলে, সাহেবের আদেশ অনুসারে খালাসী উঠিয়া, আমের ঝুড়ি হইতে আমগুলা বাহির করিয়া, পাথর ভরিয়া, তাহার উপর আম, তাহার উপর আমপাতা চাপাইয়া দিল। গাড়ী ছাড়িলে সাহেব স্বহস্তে ঝুড়ির মুখ আবার সেলাই করিয়া দিল। গুনছুঁচ, দড়ি প্রভৃতি গার্ডসাহেবদের বাক্সেই মজুদ থাকে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ট্রেণ মোগলসরাই পৌঁছিল।

কাযকর্ম্ম সারিয়া, বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে ডিসুজা কেল্‌নারের হোটেলে গিয়া এক পেয়ালা চা হুকুম করিয়া, রুটিতে মাখন মাখাইয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

চা পানান্তে বাহির হইয়া বাড়ী যাইতেছিল, পথে রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিট্যুটের কাছে দুইজন বন্ধু তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। বলিল, "চল, এক হাত পোকর খেলা যাউক।"

ইন্‌ষ্টিট্যুটে 'পানীয়' মিলে, তাহার নগদ দামও দিতে হয় না। ডিসুজা সহজেই সম্মত হইল।

দুই বাজি পোকর খেলিতে ও কয়েক পাত্র হুইস্কি পান করিতে রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। ডিসুজা তখন বলিল, "বাড়ী যাই—আমার ক্ষুধা পাইয়াছে।"—বাড়ীতে কেবল ডিসুজার বৃদ্ধা মাতা আছেন।

বাঙ্গলায় পৌঁছিয়া ডিসুজা দেখিল, তাহার মাতা রাগিয়া আগুন হইয়া বসিয়া আছেন। মেঝের উপর আমের একটি ঝুড়ি, আশে পাশে আম পাতা ছড়ান, একস্থানে গুটি ১৫।১৬ আম, এবং এক বোঝা পাথরের টুকরা।

মত্ততার অবস্থায় ডিসুজা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল না।

মিসেস্ ডিসুজা বলিলেন, "এই যে জন্—কোন্ ট্রেণে ফিরিলে?"

ডিসুজা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "এ—বাস্কেট—কোথা হইতে আসিল?

"মজঃফরপুর হইতে। আজ দ্বিপ্রহরে তোমার হবুশ্বশুরের

পত্র পাইলাম, ১৫০টা ভাল ল্যাংড়া আম পাঠাইতেছেন, খুব সম্ভব ১৫ নম্বরে তাহা এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। লিখিয়াছিলেন, রসিদ ডাকে আসিতে বিলম্ব হইতে পারে, ১৫ নম্বর আসিলে লোক পাঠাইয়া যেন ঝুড়িটা আনাইয়া লই। ট্রেণ পৌঁছিবার আধ ঘণ্টা পরেই আমি ষ্টেশনে গিয়া বাস্কেট আনিলাম। আনিয়া খুলিয়া দেখি—আম সব চুরি গিয়াছে, আমের স্থানে পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে! দেখ দেখি কাণ্ড! কি ভয়ানক কথা! ফিফ্‌টিন আপ-এ গার্ড কে ছিল খবর নাও ত!"

ডিসুজা বলিল, "ফিফ্‌টিন আপ—আমিই ত—লইয়া আসিয়াছি।"

"তুমি?—তুমি তবে এতক্ষণ ছিলে কোথা?—তুমি?—তবে আম কে লইল? বোধ হয় দীঘায়—অথবা বাঁকীপুরে—"

ডিসুজা বলিল—"না—না—ও—ও—আম—আ—আ—আমিই খাইয়াছি।"

বৃদ্ধা ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পুত্র প্রকৃতিস্থ নাই। বলিলেন, "তুমি খাইয়াছ—এই এক ঝুড়ি আম? অসম্ভব!"

ডিসুজা নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া বলিল, "বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছিল —তাই খা—খা—খাইয়া ফেলিয়াছি।"

মাতা বলিলেন, "নন্‌সেন্স। একথা এখন তোমাকে বলিয়া কোনও ফল নাই। কল্য প্রাতে এসম্বন্ধে রীতিমত তদন্ত করিয়া, ব্যাপারটা উপরিওয়ালাদের জানাইতে হইবে। সহজে আমি ছাড়িতেছি না। এতগুলা আম!—রেলের কর্ম্মচারীরা কি চোর! কি পাষণ্ড! ছি ছি ছি।"

ডাগর মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

আগন্তুক।

মুটিয়ার মাথায় মসীবর্ণ ষ্টীলট্রাঙ্ক, তদুপরি লাল-নীল ডোরাকাটা শতরঞ্জ জড়ানো এক বাণ্ডিল বিছানা, পশ্চাতে, একহাতে ছাতা অন্য হাতে মাঝারি আকারের একটি চামড়ার ব্যাগ লইয়া, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ জনৈক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ফুলপুর গ্রামে প্রবেশ করিলেন। বেলা তখন তিনটা কিম্বা সাড়ে তিনটা। আষাঢ় মাস, আকাশে মেঘ করিয়া রহিয়াছে, ছাতাটি তাই খুলিতে হয় নাই। রেল ষ্টেশন অধিক দূর নহে, ক্রোশখানেক মাত্র ব্যাবধান ;—তথা হইতে হাঁটিয়াই আসিয়াছেন।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন পাড়ায় যাবেন বাবু ?"

"পশ্চিম পাড়া।"

"কাদের বাড়ী ?"

বাবুটি কোনও উত্তর না করিয়া, পথের উভয় পার্শ্ব দেখিতে দেখিতে আপন মনে চলিলেন। দুই ধারেই জঙ্গল, মাঝে মাঝে একখানি কখিয়া বাড়ী। কিয়দ্দূর আসিয়া, এক পুরাতন মজিয়া-যাওয়া পুষ্করিণী দেখিয়া বাবুটি সেইখানে দাঁড়াইলেন ; পুকুরটির

পানে চাহিয়া রহিলেন। মুটিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "এ পশ্চিম পাড়া নয়, এ জেলে পাড়া।"—"ওঃ" বলিয়া বাবুটি আবার পথ চলিতে লাগিলেন। আরও কিছুদূর আসিয়া এক প্রাচীন বটবৃক্ষ,—সেখানে দাঁড়াইলেন। গাছটির পানে চাহিয়া রহিলেন। মুটিয়া আবার বলিল, "বাবু আবার দাঁড়ালেন যে! এটা মোড়ল পাড়া।"—"ওঃ" বলিয়া বাবুটি পুনর্ব্বার অগ্রসর হইলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া মুটিয়া বলিল, "এই পশ্চিম পাড়া আরম্ভ হল বাবু। কোন বাড়ীতে যাবেন?"

বাবুটি বলিলেন, "চল্ না, দেখা যাক্।"

মুটিয়া ভাবিল, বাবুটি বোধ হয় কোনও ভদ্রগৃহস্থের বাড়ী অতিথি হইবেন—তা সে যেখানেই হউক। কিয়দ্দূর গিয়া সে বলিল, "এইটে বিদ্যেভূষণ মশায়ের বাড়ী, তিনি মস্ত পণ্ডিত।" আর কিয়দ্দূর গিয়া বলিল, "এই চাটুয্যে-বাড়ী। আগে এঁরাই ছিলেন গাঁয়ের জমিদার।" বাবু তথাপি দাঁড়ান না দেখিয়া, মুটিয়া অগ্রসর হইল।

আরও কিছুদূর গিয়া বাবুটি আবার দাঁড়াইলেন। চতুর্দ্দিক জঙ্গলে ঘেরা একখানি ভাঙ্গা বাড়ী, অধিকাংশই পড়িয়া গিয়াছে, এখানে ওখানে এক-আধটা দেওয়াল মাত্র দাঁড়াইয়া আছে। বাবুটি সেই ভগ্নাবশেষের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মুটিয়াও কিয়দ্দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, "কতক্ষণ দাঁড়াব বাবু? কোথায় যেতে হবে চলুন।"

বাবুট তাড়াতাড়ি চাদরের প্রান্তে চক্ষুমার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "আয়, চাটুয্যে বাড়ীতে যাব।"

"চাটুয্যে-বাড়ী ত ছাড়িয়ে এলাম। সেইকালে বল্লেই হত!" —বলিয়া মুটিয়া ফিরিল।

চট্টোপাধ্যায়-ভবনে প্রবেশ করিয়া বামদিকে বৈঠকখানা। বাবুটি সেই বৈঠকখানায় গিয়া উঠিলেন। বারান্দায় এক ভৃত্য বসিয়া তামাক খাইতেছিল, সে ইঁহাকে দেখিয়া হুঁকাটি নামাইল।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে কে আছেন হে?"

ভৃত্য বলিল, "কর্ত্তা বাবু আছেন।"

"রমণকৃষ্ণ বাবু?"

ভৃত্য একটু বিস্মিত হইয়া, ইঁহার মুখপানে চাঁহিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, তিনি ত স্বর্গে।"

"তবে কে, হৃদয়কৃষ্ণ বাবু আছেন?"

ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে না, তেনারও কাল হয়েছেন। রিদয় কিষ্ট বাবুর মধ্যম পুত্তুর বিনয় কিষ্ট বাবুই এখন মালিক। জ্যেষ্ঠ পুত্তুর অতুল কিষ্ট বাবুও গত হয়েছেন।"

বাবুটি বলিলেন, "বটে! তাঁরাও গত হয়েছেন? বিনয় বাবু বাড়ী আছেন ত?"

ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে না, তিনি ঘুমুচ্ছেন।"

ইহা শুনিয়া, বাবুটির ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি দেখা দিয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল। আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। মুটিয়ার মাথা হইতে বাক্স

বিছানা নামাইয়া লইয়া, বখ্‌শিস্‌ দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। জুতা খুলিয়া চৌকির উপর পা তুলিয়া বসিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "ওহে, তোমার নামটি কি বাপু?"

"আজ্ঞে, আমার নাম কেষ্টধন মণ্ডল। আমরা সদ্গোপ।"

"সদ্গোপ? বেশ বেশ। তা, একছিলিম তামাক খাওয়াতে পার বাবা?"

"আজ্ঞে, পারি বৈকি! ব্রাহ্মণের হুঁকো?"

"হ্যাঁ, ব্রাহ্মণের হুঁকোই নিয়ে এস।"

কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণধন কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে হুঁকাটি আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথা থেকে আসছেন?"

"উপস্থিত কল্‌কাতা থেকে।"

"নিবাস?"

আগন্তুক হাত বাড়াইয়া হুঁকাটি লইয়া বলিলেন, "তোমার বাবু ঘুম থেকে উঠেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি করছেন?"

"ঘুমিয়ে উঠে একটু বিশ্রাম করছেন।"

বাবুটির মুখে পুনর্ব্বার একটু হাসি দেখা দিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুকে আমার কথা বলেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছি। তিনিই বল্লেন, বাবুটি কে, কোথা থেকে আসছেন, জিজ্ঞাসা করে আয়।"

"তোমার বাবু আমায় চিন্‌বেন হে, চিন্‌বেন। যাও, তাঁকে

ডেকে আন।”—বলিয়া আগন্তুক ধূমপান আরম্ভ করিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল। বৈঠকখানার ঘড়িটিতে ঠং ঠং করিয়া চারিটা বাজিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথা।

থেলো হুঁকাটি হাতে ফুরুৎ ফুরুৎ করিয়া যিনি তামাক খাই-তেছেন, তাঁহার নাম নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়। এই গ্রামেই ইঁহার আদিবাস। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যে ভগ্নস্তূপের নিকট দাঁড়াইয়া চাদরের প্রান্তে চক্ষু মুছিয়াছিলেন, সেই ছিল ইঁহার পৈত্রিক ভিটা ও জন্মস্থান। বিনয় বাবুদের সহিত জ্ঞাতি সম্পর্ক।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, ইস্কুল-পলায়ন জন্য পিতৃব্যের নিকট জুতা খাইয়া, খুড়ীমার বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া পিতৃমাতৃহীন নন্দলাল যখন পশ্চিমগামী হন, তখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর মাত্র। পশ্চিম বলিয়া পশ্চিম—একেবারে দেশীয় রাজ্য ভাওয়ালপুর। কতক রেলে, কতক গোরুর গাড়ীতে, বাকী হাঁটিয়া। নবাব সাহেবের নিজস্ব আদালতে পেস্কারী কর্ম্মে নিযুক্ত, নদীয়া জেলা নিবাসী রামজয় বিশ্বাস নামক এক কায়স্থ ভদ্রলোক ভাওয়ালপুরে সপরিবারে বাস করিতেন। তিনিই তখন সেখানে একমাত্র বাঙ্গালী। ক্ষুধাতুর ছিন্নবসন কপর্দ্দকশূন্য বালক নন্দলাল তাঁহারই

নিকট গিয়া আশ্রয়ভিক্ষা করিল। রামজয় দয়াপরবশ হইয়া, খোরাক পোষাক দুইটাকা বেতনে নন্দলালকে নিজগৃহে পাচক নিযুক্ত করিলেন। যাহারা ফার্সী জানে, রাজ্যে তাহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি দেখিয়া নন্দলালেরও সখ্ হইল সে ফার্সী পড়িবে। বেতনের দুইটি টাকাই ব্যয় করিয়া, প্রতিবেশী মুন্সী নেউলকিশোরের নিকট অবসর সময়ে প্রত্যহ সে উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিল। দেশে থাকিতে যে বালক বাগ্দেবীকে বাঘ তুল্য মনে করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিত, সেই, বিদেশে উদরান্নের জন্য হীনকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, লেখাপড়ায় আশ্চর্য্য মনোযোগ দেখাইতে লাগিল। দুই-তিন বৎসরেই সে উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। তাহার মেধা ও অধ্যবসায় দেখিয়া রামজয় ভারি খুসী হইয়াছিলেন; পাচকবৃত্তি ছাড়াইয়া, আদালতের নকল সেরেস্তায় ২০৲ বেতনে তাহাকে একটী মুহুরীগিরি কর্ম্ম করিয়া দিলেন। আরও দুই তিন বৎসর পরে, পেন্সন লইয়া রামজয়ের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইলে, আদালতে নন্দলালের ওকালতী করিবার সনন্দের জন্য প্রধান কাজি মির্জ্জা আসমৎউল্লা খাঁ সাহেবকে তিনি ধরিলেন। খাঁ সাহেব ফার্সীতে নন্দলালের অসাধারণ অধিকার দেখিয়া, সহজেই সনন্দ সহি করিয়া দিলেন। নবাব সরকার হইতে ভূমিদান পাইয়া রামজয় ভাওয়ালপুরে যে গৃহখানি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা, পাঁচ বৎসর মধ্যে মূল্য পরিশোধের মেয়াদে নন্দলালকে কোবালা করিয়া দিয়া তিনি দেশে চলিয়া আসিলেন।

অল্পদিনেই নন্দলালের পশার জমিয়া গেল, ওকালতীতে বেশ অর্থোপার্জ্জন হইতে লাগিল। গান্ধর্ব্ব-মতে এক সুন্দরী ষোড়শী রাজপুত বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ে কিঞ্চিৎ ইংরাজি শিক্ষা হইয়াছিল, এখন হইতে অবসর মত সে বিদ্যারও চর্চ্চা করিতে লাগিলেন।

ফুলপুর হইতে নন্দলালের পলায়নের পর তাঁহার খুড়া কিছুদিন তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। পৈত্রিক সম্পত্তির অংশীদারকে তাঁহার এই অনুসন্ধান, নিতান্তই "ঢেলামারা গোছ" হইয়াছিল। মুহুরীগিরি চাকরী হওয়ার পর নন্দলাল বাড়ীতে প্রথম চিঠি লেখেন এবং মনি-অর্ডার করিয়া খুড়ার নামে দশটি টাকা পাঠাইয়া দেন। খুড়া তখন ৺প্রাপ্ত, খুড়তুতো ভাই সে টাকা সহি করিয়া লইয়াছিল। তখন হইতে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলিত। তাঁহার উকীল হওয়ার সংবাদও গ্রামে পৌঁছিয়াছিল। রাজপুতনীকে গৃহে আনিবার পর হইতে নন্দলাল পত্রাদি বন্ধ করেন। এই রাজপুতনীর গর্ভে তাঁহার দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা-সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কেহই শৈশব অতিক্রম করিতে পারে নাই। গতবৎসর রাজপুতনীও ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। প্রথমটা নন্দলাল তাহার শোকে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন সামলাইয়া উঠিয়াছেন। তবে, ভাওয়ালপুরে আর মন টেকে না। টাকা কড়ি বিস্তর জমিয়াছে, কে তাহা ভোগ করিবে এই চিন্তাই এখন তাঁহার মনে প্রবল। সঞ্চিত অর্থে কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া, একটি স্বজাতীয়া ডাগর মেয়ে বিবাহ করিয়া অতঃপর

পৈত্রিক ভিটায় বাস করিলেই মনে শান্তি পাইবেন, এখন ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। তাই আজ পঁচিশ বৎসর পরে নন্দলাল দেশে ফিরিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, বিনয়বাবু প্রথমে নন্দলালকে চিনিতে পারিলেন না। পরে পরিচয় পাইয়া, খুব সমাদর করিয়াই তাঁহাকে গৃহে রাখিলেন। সেদিন অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত দুই বন্ধুর সুখ-দুঃখের কথা আর ফুরায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাত্রী অন্বেষণ।

সপ্তাহ মধ্যে গ্রামে রটনা হইয়া গেল, নন্দ চাটুয্যে ভাওয়াল পুরে ওকালতী করিয়া একেবারে টাকার 'কুমীর' হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, বিবাহ করিবার জন্য একটি ডাগর মেয়ে এবং ক্রয় করিবার জন্য জমিদারী সম্পত্তি খুঁজিতেছেন, পৈত্রিক ভিটায় এক ইমারত তৈয়ারি হইবে, কলিকাতায় মার্টিন কোম্পানী তাহার নক্সা প্রস্তুত করিতেছে ইত্যাদি।

এই জনরবের কিছু যে ভিত্তি ছিল না এমন নহে। দূর-গ্রাম-বাসী যে ধনী মহাজন বিনয় বাবুদের বিরুদ্ধে ডিক্রীর বলে ফুলপুর গ্রাম নিলাম-খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন, এখন তিনি ইহা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু দর হাঁকিয়াছেন অসম্ভব। দরের

কথাবার্তা চলিতেছে। গৃহনির্ম্মাণের জন্য কার্ত্তিক মাসে ইষ্টক প্রস্তুত আরম্ভ হইবে, তাহার জন্যও জমি ঠিক হইয়াছে। এবং গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর লোক, খুব একটি ভাল মেয়ে খুঁজিয়া দিবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন।

একে একে অনেকগুলি মেয়ে দেখা হইল, কিন্তু কোনটিই তাদৃশ পছন্দ হইল না। বেশী ডাগর মেয়ে পাড়াগাঁয়ে পাওয়া একটু শক্ত—যাহাও বা দুই একটি আছে, তাহারা সুন্দরী নহে। একটি মেয়ে পাওয়া গিয়াছে, বয়স ১৪।১৫, সে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। —আর একটি আছে, খুব সুন্দরী বটে, কিন্তু বয়স তাহার ১২ বৎসর মাত্র। এই দুইটি মেয়ে সম্বন্ধে নন্দবাবু বিষম দ্বিধায় পড়িয়া গিয়াছেন, কাহাকে মনোনীত করিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। পাড়ার একজন রসিক ঠাকুর্দ্দা বলিয়াছেন, "তুমি ত কুলীনের ছেলে হে, তার আর ভাবনা কি? ও দুটিকেই বিয়ে করে ফেল, ল্যাঠা চুকে যাক্।"

আগামী রবিবারে বিনয়বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন। স্বর্ণকার ডাকাইয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া নন্দবাবু বন্ধু-তনয়ের মুখ দেখিবার জন্য একছড়া হার ফরমায়েস দিতেছিলেন, এমন সময় একখানি চিঠি হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে বিনয়বাবু প্রবেশ করিলেন। নন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, হাসছ কেন?"

বিনয় বলিলেন, "আগে সেকরাকে বিদায় কর, তারপর বলছি।"

স্বর্ণকারকে কয়েকটি গিনি ও উপযুক্ত উপদেশ দিয়া, "ঝবুলে

ত, শনিবার বিকেলবেলা হার ছড়াটি চাই-ই চাই—দেখো যেন দেরী না হয়" প্রভৃতি কথায় সাবধান করিয়া নন্দবাবু তাহাকে বিদায় দিলেন। তখন নিরিবিলি পাইয়া বিনয়বাবু বলিলেন, "ওহে, ডাগর মেয়ে ডাগর মেয়ে করে হেদুচ্চ, একটি খুব ডাগর মেয়ে আসছে।"

"কোথা আসছে?"

"এই আমাদের বাড়ীতেই আসছে।"

"কোথা থেকে আসছে?"

"কলকাতা থেকে। আমার মেজ শালা হরিভূষণ কলকাতায় থাকেন, তিনি তাঁর স্ত্রী, ছেলে মেয়ে নিয়ে খোকার অন্নপ্রাশনে আসছেন। এই মেয়েটি, আমার শালাজ ঠাকরুণের মাস্তুতো বোন। তারা অন্য বাড়ীতে থাকে। সেও এঁদের সঙ্গে আসছে।"

"তুমি দেখেছ সে মেয়েকে?"

"দেখেছি। গত বৎসর কলকাতাতেই দেখেছি।"

"কেমন দেখতে? বয়স কত?"

"দেখতে খুব সুন্দরী যে, তা নয়। তবে মুখশ্রী গড়ন-পিটন, বেশ। কথাগুলি তার ভারি মিষ্টি। বয়স—এই ষোল কি সতেরো হবে আর কি। কিন্তু, তাই বলে লাফিয়ে উঠো না ভায়া, কিঞ্চিৎ বাধাও আছে।"—বলিয়া বিনয়বাবু ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিলেন।

নন্দলাল উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাধা?"

"তারা ব্রহ্মজ্ঞানী।"

শুনিয়া নিরাশ ভাবে নন্দলাল বলেন, "ব্রহ্মজ্ঞানী! তকে আর কি হবে? বেল পাকলে কাগের কি, বল! —তা, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে, হিঁদুর বাড়ীতে যে আস্‌ছেন? বাড়ীতে শালগ্রাম আনতে হবে, সহ্য করতে পারবেন?"

বিনয়বাবু বলিলেন, "সে ওসব ধর্ম্ম টর্ম্ম নিয়ে মথা ঘামায় না—সে হল একজন কবি। মাসিক পত্রে শ্রীমতী কাননবালা দেবী সই-করা কবিতা ছাপা হয়, দেখেছ কখনও?"

"কৈ, না।"

"চিরকাল পড়ে' আছ খোট্টার দেশে, বাঙ্গলা সাহিত্যের কোনও খবরই রাখ না!—এ, সেই কবি কাননবালা।"

"বেশ লেখাপড়া জানে তা হলে?"

"খুব।—সে কি করতে আস্‌ছে জান? পাড়াগাঁ দেখতে আসছে। আজ কাল পাড়াগাঁ বর্ণনা করা কবিদের ভারি ফেসান হয়েছে কি না! যত জেলে কলু হাড়ি মুচির ঘরকন্নার কথা, পানা-পুকুর পচা ডোবা শেওড়া বনের বর্ণনা, কবিরা আদা-জল খেয়ে বর্ণনা আরম্ভ করে দিয়েছেন। কাননবালা ত কখনও পাড়াগাঁ দেখেনি, চিরকাল কলকাতাতেই মানুষ; ঐ সব বর্ণনা করতে না পেরে অন্য কবিদের কাছে সে হেরে যাচ্ছে। তাই তার খেয়াল হয়েছে, পাড়াগাঁ দেখ্‌বে। এই যে আমার শালাজ কি লিখেছেন দেখনা"—বলিয়া বিনয়বাবুর পত্রখানি নন্দলালের হস্তে দিলেন।

নন্দলাল বাবু পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া ধীরে

ধীরে পত্রখানি পাঠ করিলেন। শেষে বলিলেন, "তা, এসে দেখুন। পানাপুকুর শেওড়া বনের কিছু অভাব নেই এখানে। আমরাও এই সুযোগে কবিদর্শন করে' নিই।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কবি-দর্শন।

শুক্রবার হইতেই বিনয়বাবুর গৃহে জ্ঞাতি-কুটুম্ব সমাগম আরম্ভ হইল। শনিবার অপরাহ্নের গাড়ীতে হরিভূষণ বাবু সপরিবারে আসিয়া পৌছিলেন। শ্যালক ও শ্যালক-পত্নীকে অভ্যর্থনা করিয়া বিনয়বাবু অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। সোণার চশমা চোখে, বছর বাইশ তেইশ বয়সের এক যুবক, ব্যাগ হাতে করিয়া বৈঠক-খানায় প্রবেশ করিল। ব্যাগটা ধুপ করিয়া ফেলিয়া, চৌকির উপর বসিয়া খবরের কাগজ নাড়িয়া নিজেকে হাওয়া করিতে লাগিল। "উঃ কি গরম! ফ্যান্‌ও নেই দেখ্‌ছি"—বলিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল।

নন্দবাবু সেইখানে বসিয়া ছিলেন। বলিলেন, "পাড়াগাঁয়ে আর ফ্যান্ কোথায় পাবেন বলুন? এখানে ত বিদ্যুতের কল নেই।"

যুবক বলিল, "গোটাকতক ইয়ষ্ট-ফ্যান্ এনে রাখলেই হয়। কেরোসিন তেলে চলে। কিংবা টানা-পাখা।"

নন্দবাবু বলিলেন, "তা আছে বৈকি,—বড় বড় লোকের বাড়ীতে আছে। আমাদের ত সে অবস্থা সে রকম নয়!"

একথা শুনিয়া যুবক যেন একটু অপ্রতিভ হইল। বলিল, "আর পাড়াগাঁয়ে বোধ হয় অত দরকারও হয় না। চারিদিকে এই সব খাল বিল বন জঙ্গল থাকাতে অনেকটা ঠাণ্ডা রাখে। মশায় কি—এই বাড়ীরই—"

নন্দলাল বলিলেন "না আমি এ বাড়ীর নই। এঁরা আমার বন্ধু, জ্ঞাতিও বটেন। আপনার নামটি কি?"

যুবক বলিল, "আমার নাম দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। হরিভূষণ বাবু যিনি এসেছেন, উনি সম্পর্কে আমার ভগ্নীপতি হন।"

নন্দলাল বাবু বলিলেন, "ওঃ তা বেশ বেশ। তামাক ইচ্ছে করুন।"—বলিয়া হুঁকাটি বাড়াইয়া দিলেন।

দেবকুমার বলিল, "সর্ব্বনাশ!—হুঁকোর জাতটি এক্ষণি মারা যাবে। আমি যে ব্রাহ্ম।"—বলিয়া সে হাহা করিয়া হাসিতে লাগিল। শেষে বলিল, "আমি তামাক খাইনে।"

নন্দলাল বলিলেন, "হলেনই বা ব্রাহ্ম, তাতে কি হয়েছে? হুঁকোর জাত যাবে কেন? ওসব প্রেজুডিস্ আমার নেই।"

অন্যান্য দুই চারিটি কথার পর নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের সঙ্গে কে একটি মেয়ে এসেছেন, তিনি নাকি খুব ভাল পদ্য লিখ্‌তে পারেন?"

যুবক বলিল, "কানন? হ্যাঁ, কবিতা লেখে বটে।"

"উনি কি আপনার কেউ হন?"

"আমার মাস্‌তুতো ভাইয়ের পিস্‌তুতো বোন। ওঁদেরই বাড়ীতে আমি মানুষ; তবে এখন আলাদা থাকি বটে।"

মাস্‌তুতো ভাইয়ের পিস্‌তুতো বোন পদার্থটা কি নন্দলাল বাবু হঠাৎ ধারণা করিতে পারিলেন না। মনে মনে হিসাব করিতে লাগিলেন। এমন সময় বিনয় বাবু আসিয়া বলিলেন, "ওহে দেবকুমার; তোমার দিদি ডাকছেন, বাড়ীর ভিতর যাও। মুখ হাত ধুয়ে একটু জলটল খাওগে। কেষ্টা, যা, বাবুকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা।"

দেবকুমার চলিয়া গেলে বিনয় বাবু চুপি চুপি বলিলেন, "যদি ব্রাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করতে কোনও আপত্তি না থাকে, তবে এই সুযোগ ভায়া। আমি তোমার পথ অনেকটা পরিস্কার করেও এসেছি।"

নন্দবাবু আগ্রহের সহিত বলিলেন, "কি রকম?"

বিনয় বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "নন্দন আমায় বল্লে জামাই বাবু,—আমাকে, আমার শালাজের সম্পর্ক ধরে' ডাকে কিনা—বল্লে জামাই বাবু, সাতটি দিন ত আমার মেয়াদ, এই সাত দিনে, পাড়াগাঁয়ে যা কিছু দেখবার আছে আমায় দেখিয়ে দিতে হবে কিন্তু। আমি বল্লাম বেশ ত, খুব চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াও। সে বল্লে, আমি কার সঙ্গে যাব? আপনি আমায় নিয়ে যাবেন? আমি মাথা চুলকে বল্লাম—আমার ত অত সময় হবে না। আমি বরঞ্চ তোমায় একজন গাইড্ ঠিক করে দিচ্ছি। আমারই একজন বন্ধু, প্রবীণ লোক

আর, তিনিও কবি। তবে বাঙ্গলা কবি ন'ন, ফার্সী ভাষায় অতি সুন্দর সুন্দর কবিতা তাঁর আছে।"

নন্দলাল বলিলেন, "এতগুলি মিথ্যে কথা বলেছ?"

"কেন, মিথ্যেটা কি বলেছি?"

"প্রথম নম্বর, আমি নিজে কবি নই। যে সব ফার্সী কবিতা মাঝে মাঝে তোমার কাছে আওড়াই, তা সব বড় কবির রচনা—হাফেজ, সাদী, ফির্দৌসী। দ্বিতীয় নম্বর, আমি প্রবীণ লোক নই। আমার বয়স মোটে একচল্লিশ বছর। মাথায় টাক পড়লে আর চশমা নিলেই কি মানুষ প্রবীণ হয়?"

বিনয় বলিলেন, "ওহে বুঝচনা? তোমায় প্রবীণ বলে বর্ণনা না করলে মেয়েটি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে চাইবে কেন? তারপর, কবিতা টবিতা বলে তুমি তোমার নবীনত্ব প্রমাণ করে' দিও এখন।"

নন্দলাল বলিলেন, "ওঁকে নিয়ে রোজ আমায় বেড়াতে যেতে হবে নাকি?"

"হবে না?— নৈলে কে নিয়ে যাবে?"

"কেন, ঐ যে ছোকরাটি এসেছে—পিস্তুতো বোনের মাস্তুতো ভাই না কি শুনলাম।"

বিনয় বলিলেন, "তাও কি হয়? তোমাকেই যেতে হবে। তুমি কবি শুনে, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্তে মেয়েটি অস্থির হয়েছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, তাঁর কি কোনও ছাপানো ফার্সী কেতাব আছে? আমি বল্লাম—তা ত জানিনে,

একটু পরেই তিনি জল খেতে ভিতরে আসবেন, সেই সময় তুমি বরং জিজ্ঞাসা কোরো।"

নন্দলাল বাবু বলিলেন, "তুমি ত ভাল কাণ্ডটি বাধিয়ে বসেছ দেখছি! ওসব স্বাধীনতাওয়ালা মেয়েছেলের সঙ্গে আমি কি বেড়াতে পারি? আমার চৌদ্দ পুরুষে কখনও বেড়ায়নি! সে সব আমি পারবো না ভাই। আমরা সেকেলে মানুষ, ও সব ইংরিজি ধরণধারণ জানিও না, বুঝিও নে; কি বলতে কি বলব, শেষে আমায় একটা জানোয়ার ঠাওরাবে।"

কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টা পরে নন্দবাবু যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, কাননবালা আসিয়া প্রণাম করিয়া অতি সহজ ভাবে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিল, তখন "স্বাধীনতাওয়ালা মেয়েছেলে" সম্বন্ধে নন্দলাল বাবুর সকল শঙ্কা দূর হইয়া গেল; —এমন কি, যে যে পত্রিকায় কাননবালার কবিতা ছাপা হইয়াছে, তা যদি সঙ্গে থাকে তবে সেগুলি দেখিবার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভালবাসার নূতন থিওরি।

বিনয় বাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। সোমবার প্রাতের ট্রেণে হরিভূষণ বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। দেবকুমার রহিল, সে এক সপ্তাহ পরে মেয়েদের লইয়া যাইবে।

প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্নে কাননবালা সাজিয়া গুজিয়া জুতামোজা পরিয়া নন্দলাল বাবুর সঙ্গে পাড়াগাঁ দেখিতে বাহির হয়। চাষাভূষার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মেয়েদের সঙ্গে নানা গল্প জুড়িয়া দেয়, নন্দলাল বাবু বাহিরে বসিয়া কলাপাতেরর নলে দা-কাটা তামাকু সেবন করেন। কাননবালা মাঠে গিয়া চাষাদের নাঙলচষা, পুকুর ধারে দাঁড়াইয়া জেলেদের মাছ ধরা, ছুতার বাড়ী গিয়া ছুতার-মেয়েদের চিঁড়ে কোটা—এই সব দেখিয়া বেড়ায় এবং প্রশ্নে প্রশ্নে নন্দলাল বাবুকে অস্থির করিয়া তুলে। মাঝে মাঝে পকেট হইতে ছোট একখানি খাতা বাহির করিয়া নোট করিয়া লয়। নোটগুলি কতকটা এই ধরণের:—"ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোমরে একপ্রকার রঙীন সূতা বাঁধা থাকে তাহাকে ঘুন্সী বলে। মেয়েরা চেরা বাঁশে নির্ম্মিত এক প্রকার লম্বা গোল (cylindrical) পাত্রে পুকুর ঘাট হইতে চাউল ধুইয়া আনে, ঐ পাত্রের নাম ধুচুনী। পল্লীগ্রামে তামাককে গুড়ুক এবং দাড়ি কামানোকে খেউরি হওয়া বলে। বর্ষাকালে বনে জঙ্গলে পাতালফোঁড় নামক একপ্রকার বৃহৎ লাল ফুল (ডাল নাই পাতা নাই) মাটী ফুঁড়িয়া বাহির হয়, অনেক দূর হইতে ইহার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।" ইত্যাদি। শ্রান্ত হইলে পাকা সড়কের পুলের আলিসায় বসিয়া দুইজনে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখে। নন্দবাবু মাঝে মাঝে ফার্সী কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেন—এক একটির কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে কাননবালা একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; খাতা

বাহির করিয়া সমগ্র কবিতাটি অর্থসহ লিখিয়া লয়। এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল।

* * * *

দেবকুমার নন্দবাবুর সহিত বৈঠকখানাতেই শয়ন করিত। একদিন রাত্রে সে বলিল, "নন্দবাবু, আপনি শুন্‌লাম অবিবাহিত।"

নন্দবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ।"

"আপনি শুন্‌লাম একটি বয়স্থা সুন্দরী মেয়ে খুঁজছেন, কিন্তু মনের মতনটি পাচ্ছেন না।"

নন্দলাল বাবু হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই বটে। তুমি ঘট্‌কালি করবে না কি?"

দেবকুমার বলিল, "যদি বলেন ত পারি বৈকি! আচ্ছা, আপনার ত ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে কোনও প্রেজুডিস্ নেই সেদিন বল্লেন। যদি একটি বয়স্থা সুন্দরী ব্রাহ্ম মেয়ে পান, তা হলে কোনও আপত্তি আছে কি?"

নন্দবাবু বলিলেন, "কোথা সে মেয়ে?"

দেবকুমার বলিল, "এই ধরুন, আমাদের কাননবালার কথাই যদি বলি। ওর জন্যে একটি ভাল পাত্র দরকার ত!"

নন্দলাল বাবু বলিলেন, "তা, আমাকে কি তুমি ভাল পাত্র ঠাওরালে?"

"কিসে নয়? বিদ্যায়, অর্থে, পদমর্য্যাদায়—"

"আমার বয়স চল্লিশ বৎসর।"—কথা সংক্ষেপ করিবার

জন্যই নন্দলাল বাবু একচল্লিশ স্থানে চল্লিশ বলিলেন, অথবা বলিবার ভুল, তাহা আমরা অবগত নহি।

দেবকুমার বলিল, "চল্লিশ আর বেশী বয়স কি? আমাদের সমাজে ত লোকে নিজে বিলক্ষণ উপার্জ্জনক্ষম না হলে বিবাহই করে না। চল্লিশ বৎসরে প্রথম বিবাহ ত আমাদের সমাজে ঢের লোকেরই হয়।"

নন্দলাল বলিলেন, "বয়স সম্বন্ধে আপত্তি না হলেও, অন্য সব বিষয়ে ত আপত্তি হতে পারে। রূপে, গুণে, কিসে আমি কাননবালার যোগ্য? ওর মা বাপের যদি আপত্তি নাও হয়, ওর নিজের ত আপত্তি থাকতে পারে!"

দেবকুমার হেঁহেঁ করিয়া হাসিতে লাগিল।

নন্দবাবু বলিলেন, "হাসছ যে?"

দেবকুমার বলিল, "আপনার কথা শুনে। বল্লেন কিনা কানন কি আমায় পছন্দ করবে?—তাই হাসি পেল।"

নন্দবাবু বলিলেন, "কেন, তাতে হাসবার কারণ কি হল?"

"সে কথাটা গোপনীয়। আপনাকে বলা উচিত হবে কিনা তাই ভাবছি। আচ্ছা, বলিই না হয়। কিন্তু কাউকে আপনি বলবেন না প্রতিজ্ঞা করুন।"

নন্দবাবু অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত বলিলেন, "আচ্ছা কাউকে বলব না। কথাটা কি?"

দেবকুমার উঠিয়া, নিজের মশারি হইতে মুখ বাহির করিয়া,

নন্দলাল বাবুর মশারিতে মুখ চাপিয়া তাঁহার কাণের কাছে বলিল "আপনাকে কাননের ভারি পছন্দ হয়েছে।

নন্দলাল বাবু উচ্চ শব্দে বলিয়া উঠিলেন—"ধুৎ!"—কিন্তু তাঁহার বুকের ভিতরটা গুর্‌গুর্ করিতে লাগিল।

দেবকুমার বলিল, "সত্যি বলছি আপনাকে।"

নন্দ বলিলেন, "যাও যাও আর ঠাট্টা করতে হবেনা। কিসে বুঝলে, শুনি?"

"এ আর বোঝাবুঝি কি? কাননের কথাতেই আমি বুঝেছি।"

"কথাতেই? কি বলেছে সে?"

"আপনার কথা সে যে রকম করে' বলে, তাতেই বেশ বুঝতে পারা যায়। আপনার সুখ্যাতি তার মুখে আর ধরে না। আপনার ফার্সী কবিতা শুনে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে। সত্যি কথাটা বলেই ফেলি। সে স্পষ্টই আমাকে বলেছে, নন্দবাবুকে আমি ভালবাসি। আমার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই ওর ভাব কিনা, এক বাড়ীতে ছিলাম, একসঙ্গে খেলা করেছি—আমার কাছে ওর কোন কথাই গোপন নেই। এমন কথা পর্য্যন্ত বলেছে—উনি ত একটি ডাগর মেয়ে খুঁজছিলেনই, কি জানি যদি আমাকে ওঁর পছন্দই হয়, আমাকে প্রোপোজই করেন, আমার বাপ মা রাজি হবেন ত?—এই ত অবস্থা মশায়। আপনাকে খুলেই বল্লাম—দোহাই আপনার, কথা যেন প্রকাশ না হয়।"

নন্দবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য ত!"

"আমারই প্রথম প্রথম একটু আশ্চর্য্য ঠেকেছিল যে আপনার

দিকে ও এ-রকম ঢলে পড়লো কেন! তারপর ভেবে চিন্তে কারণটা বেশ জলের মত বুঝতে পারলাম। এ সম্বন্ধে আমার একটা থিওরিই আছে কিনা।"

"কি থিওরি ?"

"থিওরিটা এই। দুই আর দুই—চার। তিনও নয় পাঁচও নয়। সেই রকম, উপযুক্ত বয়সের ও সামাজিক অবস্থার একজন মেয়ে কবি আর একজন পুরুষ কবিকে একসঙ্গে করে' দিন—তারা পরস্পরকে ভালবাসবেই বাসবে। কিন্তু অন্য কিছু হলে হবে না, দু'জনেই কবি হওয়া চাই। কবিদের প্রাণটা ভারি মোলায়েম কিনা! আপনিও কবি—না—প্রতিবাদ করবেন না—পাখী সব করে রব রাতি পোহাইলো, কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিলো—ইলো আর টিলো মিল করতে জান্‌লেই কবি হয় না। যার কবির হৃদয় আছে সেই কবি—সেই হিসাবে আপনি কবি। দুজনেই কবি—সুতরাং দুই আর দুইয়ে চার হয়েছে ; এ আর নতুন কথা কি ?"

নন্দবাবু নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। দেবকুমার আধ মিনিট কাল অপেক্ষা করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"নন্দবাবু!"

"কি ?"

"একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী—একথা মানেন ত ?"

নন্দবাবু ভাবিলেন, আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে কোনও আপত্তি হইবে কিনা, তাহা জানিবার জন্যই বোধ হয় জেরা করিতেছে। বলিলেন, "মানি বৈকি।"

দেবকুমার বলিলেন, "ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী—এখানেও তিনি উপস্থিত। আপনি ঈশ্বরসাক্ষী বলুন দেখি, কাননবালার প্রতি এ ক'দিনে আপনার কিঞ্চিৎ প্রেমভাব হয়েছে কি না?"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া নন্দবাবু বলিলেন, "হয়েছে।"

দেবকুমার বলিয়া উঠিল, "তা'হলে, আমার থিওরি নিঃসংশয়েই প্রমাণ হয়ে গেল। আপনারা যখন পরস্পরকে ভালবেসেছেন, তখন এর একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম—বিবাহ। কথাটা আপনি ভেবে দেখ্‌বেন নন্দবাবু। আজ আর এ বিষয়ে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করব না। কাল দুজনে কোনও সময় নিরিবিলিতে একথা হবে।"—বলিয়া দেবকুমার পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইল।

নন্দলাল কিন্তু সারারাত্রি চক্ষুর পাতা বুজিতে পারিলেন না।

পরদিন নিভৃতে দেবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নন্দলাল তাহাকে বলিলেন, "ভায়া, কাননকে আমি বিবাহ করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু 'প্রোপোজ' কি করে' করতে হয় আমি ত কিছুই জানিনে। ওঁর বাপ মাকে চিঠি লিখব?—না, কি করবো?—আমি ত ভাই এ সব ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি, কি করতে টরতে হবে সব আমায় বলে দাও।"

দেবকুমার বলিল, "আমরা ত আজ রাত্রের ট্রেণেই চল্লাম;—দু'চারিদিন পরে আপনাকেও তা হলে কলকাতায় আসতে হয়।"

"তার পর।"

"ওঁদের বাড়ী আপনাকে আমি নিয়ে যাব, ওঁর বাপ মার সঙ্গে

আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। আপনি যাতায়াত আরম্ভ করবেন।"

"তার পর ?"

দেবকুমার বলিল, "যাতায়াত করতে করতে, একদিন সুযোগ বুঝে, কাননের কাছেই আপনি 'প্রোপোজ' করবেন।"

"তার পর ?"

"কানন রাজি হলে,—রাজি ত হবেই, ও ত আপনারই দিকে —তার পর ওর বাপ মাকে বলতে হবে। তাঁদের মন আমি আগে থাকৃতেই ভিজিয়ে রাখব এখন। তাঁরা সম্মতি দিলেই বিবাহ স্থির হবে—অর্থাৎ আমরা যাকে 'এন্‌গেজ্‌মেণ্ট' বলি তাই হবে।"

"তার পর ?"

"তার পর থেকেই ওঁরা আপনাকে প্রায়ই আহারের নিমন্ত্রণ করবেন। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনি ছুরি কাঁটা ব্যবহার করতে জানেন ত ? ওঁরা আবার টেবিলে খান কি না।"

"না, ছুরি কাঁটা ত কখনও ধরিনি ভাই।"

"আচ্ছা, সে আপনাকে আমি শিখিয়ে নেব। এমন কিছু শক্ত নয়। দু'চারদিন অভ্যেস করলেই হবে—আপনি কলকাতায় আসুন ত। ভাল কথা—রামপাখী টাখী আপনার চলে ?"

নন্দলাল বলিলেন, "না ভাই। মুসলমান রাজ্যে থাকি বটে, কিন্তু ওটা ত কখনও খাই নি। না খেলে কি—নিতান্তই— চলবে না ?"

দেবকুমার একটু চিন্তিত হইয়া বলিল, "চলা একটু শক্ত বটে। আর কিছু নয়, ওঁরা মনে করতে পারেন, লোকটা ভারি কুসংস্কারাপন্ন। আজকাল না খাচ্চে কে ? ওটা আর শিখে নিতে পারবেন না ?"

"তা, নেহাৎ যদি দরকার হয়, না হয় শিখেই নেব। তার জন্যে আটকাবে না।"

সারাদিন ধরিয়া দুইজনে নানারূপ পরামর্শ চলিল। স্থির হইল, দেবকুমার কলিকাতায় পৌঁছিয়াই ইঁহার জন্য একটি ছোটখাট বাড়ীর সন্ধান করিবে। বাড়ী ও চাকর বামুন ঠিক করিয়া সংবাদ দিলেই নন্দলালবাবু কলিকাতা যাইবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমাজ সমস্যা।

দেবকুমার, কাননবালা প্রভৃতিকে লইয়া রাত্রের ট্রেণেই কলিকাতা চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে বিনয়বাবুও একটু কাযে গ্রামান্তরে গমন করিলেন, দুই তিন দিন পরে ফিরিবেন।

নন্দলাল বাবুর মনটা বড় উদাস। কিছুই আর ভাল লাগেনা। লোক জন সাক্ষাৎ করিতে আসিলে বিরক্ত হন। কোথাও বাহির হন না—বৈঠকখানার বারান্দায় চুপটি করিয়া বসিয়া তামাক খান, আর মনের মধ্যে কাননবালাকে ধ্যান

করেন। কবে সে কোন মিষ্ট কথাটি বলিয়াছিল, দিনে দশবার তাহাই মনে পড়ে। কেবলই কল্পনা করেন, কাননের সহিত যেন তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, কানন তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহখানি আলো করিয়া রহিয়াছে। সুখের ও আনন্দের পার নাই কূল নাই —ভাবিতে ভাবিতে নন্দবাবু বিহ্বল হইয়া পড়েন। খালি মনে হয়, কানন এখন কলিকাতায় কি করিতেছে, তাঁহারই কথা ভাবিতেছে কি না! কলিকাতায় যাইবার জন্য, কাননকে আবার দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণটা ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

তিন দিন পরে বিনয়বাবু বাড়ী ফিরিলেন। বন্ধুর মনটি উদাস দেখিয়া বলিলেন, "ভায়া, তুমি যেন একটু হতাশ হয়েছ মনে হচ্চে। আমি বলি কি, ঐ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মেয়েটিকেই বিয়ে করে ফেল। আমি শুন্‌লাম, অন্য মেয়েটির চেয়ে রূপে একটু খাটো হলেও, গুণে সেটুকু ও পুষিয়ে নিয়েছে। আমার স্ত্রী বলছিলেন, মেয়েটির স্বভাবটি ভারি নরম—যেমন বুদ্ধি বিবেচনা, সেবা যত্ন করতেও তেমনি পটু। কি বল, কথা দেবো ওর বাপকে?"

নন্দলাল বাবু বলিলেন, "না ভাই, থাক। আমি ওকে বিয়ে করতে চাইনে।"

"তবে? কাকে বিয়ে করতে চাও?"

"যাকে চাই, তাকে দিতে পারবে?"

"কাকে চাও, শুনি?"

"কাননবালাকে।"

বিনয় বাবু বলিলেন, "বল কি হে? অঁ্যা! ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করবে? জাতটি যাবে যে!"

"জাত গেল ত বয়েই গেল।"

বিনয় কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া বন্ধুর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "ও কি কথা হে? সত্যি বলছ তুমি?"

নন্দবাবু যেন একটু অধীর হইয়াই বলিলেন, "তোমার যে অন্ত পাওয়া ভার দেখ্‌ছি। গোড়ায় তুমিই বলেছিলে খাসা একটি ডাগর মেয়ে আসছে, যদি বিয়ে করতে চাও ত এই সুযোগ!—এখন এ রকম কথা বলছ কেন?"

বিনয়বাবু বলিলেন, "আমি তখন আমোদ করে বলেছিলাম বৈ ত নয়। আমি কি তখন জানি যে সত্যিই তুমি ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপবে—বিশেষ এই বয়সে?"

ইহার পর নন্দলাল নিজের মনের অবস্থাটা অল্পে অল্পে সবই বিনয় বাবুকে বলিলেন। দেবকুমার যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছে—সকল কথা নয়—তাহারও কিছু কিছু প্রকাশ করিলেন।

সকল কথা শুনিয়া বিনয়বাবু বলিল, "তাই ত হে, বুড়ো বয়সে তোমায় এ-রোগে ধরলো? এ ত বড় সোজা রোগ নয়!"

নন্দ বলিলেন, "রোগ ত সোজা নয়ই;—আরোগ্য হতেও ইচ্ছে করে না।"

বিনয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ও রোগের লক্ষণই ত তাই ভায়া। তা, তোমার মনের ভাব যখন এ রকমটাই দাঁড়িয়েছে, তখন বিবাহ কর, আমি বাধা দেবো না। আর ব্রাহ্ম হলেও, ব্রাহ্মণের মেয়ে ত

বটে। ওর বাপ ব্রাহ্ম হবার আগে মস্ত কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিয়েটা ত হয়ে যাক্, তরে পর দুজনে একটা প্রায়শ্চিত্ত-টিত্ত করে নিও। ফুলপুর যদি তোমায় কিনে দিতে পারি—আশা ত আছে পারবো—তখন তুমি হবে গ্রামের জমিদার; কোনও ব্যাটা টঁ্যা ফোঁ করতে পারবে না। ভট্টচায্যি মশায়দের—"

নন্দবাবু বলিলেন, "তাই হবে। সেই ব্যবস্থাই হবে। শুভকর্ম্মটা ত আগে হয়েই যাক্। এখন থেকে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিয়ে দরকার নেই।"

বিনয় হাসিয়া বলিলেন, "যে রকম শুনছি, সে ত হয়েই গেছে ধর। কথায় বলে, গাই-বাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে দুধ খাওয়ায়।"

নন্দলাল কৃত্রিম রোষে বলিলেন, "চুপ্! এটা কি একটা উপমা হল?"

বিনয় বাবু বলিলেন, "কেন, মন্দ কি হল? তুমি একটা উপমা দিলে, তাই আমিও একটা দিলাম।—সম্পর্কে গাই বাছুর না হলেও, বয়সে ত বটে!"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

দুই দিন ধরিয়া উভয় বন্ধুতে এ সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ হইল। স্থির হইল, এখন বিবাহ করিয়া দেশে না আসিয়া, কলিকাতা হইতেই ভাওয়ালপুরে চলিয়া যাওয়া ভাল। বাড়ীখানি তৈয়ারি হইতেও অন্ততঃ পক্ষে বছর খানেক লাগিবে। ফুলপুরের বর্ত্তমান অধিকারী এখন যেরূপ মূল্য হাঁকিয়াছেন, কিছুদিন চুপচাপ থাকিলে সে মূল্যও কিছু কমিতে পারে। সকল দিক বিবেচনা

করিয়া এখন দুই তিন বৎসর এখানে বধূসহ না আসাই ভাল।

কয়েকদিন পরে কলিকাতা হইতে দেবকুমারের পত্র আসিল, বাড়ী প্রভৃতি ঠিক হইয়াছে। নন্দলাল বাবু কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বিনয় বাবু ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভ্রান্তি-নিরাস।

আজ একমাস নন্দবাবু কলিকাতায় আ[illegible]য়াছেন। কাননবালার পিতা সুরেশ বাবুর সহিত তাঁহার বেশ আলাপ পরিচয় হইয়াছে, যাতায়াতও আরম্ভ করিয়াছেন। কাননের মাতা বলিয়া থাকেন—"লোকটি ভারি চমৎকার। এমন সরল আর অমায়িক, যেন ছেলেমানুষটি।" প্রায়ই বিকাল বেলা উহাদের বাটীতে যান। ভাওয়ালপুর রাজ্যের নানাবিধ গল্প করেন, ফার্সী কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেন; কাননবালা একখানি মস্ত খাতায় ইহাঁর নিকট শ্রুত ভাল ভাল ফার্সী কবিতা টুকিয়া রাখে। খাতা প্রায় ভরিয়া আসিল। সে ইহাঁর নিকট ফার্সী পড়িতেও

আরম্ভ করিয়াছে। যে যে মাসিকপত্রে কাননের কবিতা বাহির হয়, নন্দবাবু তাহার সকল গুলির গ্রাহক হইয়াছেন। কাননের অনেক কবিতা তিনি ফার্সীতে তর্জ্জমাও করিয়াছেন।- শীঘ্র সে গুলি বহি করিয়া ছাপাইবেন।

কিন্তু একটা বিষয় নন্দবাবু কিছুই বুঝিতে পারেন না। দেবকুমার, কাননের মনের ভাবের যে সংবাদ দিয়াছিল, অদ্যাবধি কাননের ব্যবহারে তাহার কিছুমাত্র বাহ্যচিহ্ন নন্দবাবু দেখিতে পান না। ভাবেন, দেবু কি তবে উপহাস করিয়া ঐ সকল কথা বলিয়াছিল? না, তরুণীর স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃই কানন তাহার মনোভাব প্রকাশ করে না?—নন্দবাবু সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

একদিন তাঁহার পৌছিতে একটু বিলম্ব হইল। সেখানে গিয়া শুনিলেন, সুরেশ বাবু সস্ত্রীক কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, কানন বাড়ী আছে। কাননের সঙ্গে বসিয়া তিনি গল্পগুজব ও কাব্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর ছাদে জ্যোৎস্নায় বেড়াইতে বেড়াইতে, নন্দবাবু কাননকে নিজের মনের কথাটি বলিলেন।

শুনিয়া কাননবালা যেন কাঠ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সে কথা কহিতে পারিল না।

নন্দবাবু বলিলেন, "বল কানন, উত্তর দাও। আমি নিজেকে তোমার পায়ের কাছে রেখে দিলাম। বল কানন, তুমি আমায় নেবে কি না। এ দেড় মাস, দিনে তুমি আমার ধ্যান, রাত্রে

তুমি আমার স্বপ্ন,--তোমার আশাতেই আমি প্রাণ ধরে আছি। বল, তুমি আমার আশা পূর্ণ করবে কি না।"

এইবার কাননের চক্ষে জল আসিল। সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "নন্দ বাবু, এ কথা আপনি আমায় কেন বলছেন?—ছি ছি আর বলবেন না। বড় ভাইকে কিংবা অন্য কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়কে লোকে যে চোখে দেখে, আমি যে এতদিন আপনাকে ঠিক সেই চোখেই দেখে এসেছি! আপনার কাছে আমি কত শিখেছি—আমি ছাত্রী, আপনি গুরু—আপনার আমার মধ্যে এই সম্পর্কই ত এতদিন জানতাম!"

নন্দলাল বলিলেন, "কানন, তোমার আমার মধ্যে বয়সে যা তফাৎ, তাতে আমাকে ওরকম মনে করা তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়। আমি তোমার নিতান্তই অযোগ্য, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু যে অযোগ্য, তাকে কি খুব সামান্য একটুখানি ভালবাসা যায় না? আমি এমন বলছি নে যে আজ থেকে তুমি আমাকে, লয়লা যেমন মজনুকে ভালবাসতো, সেই ভালবাসা আমায় দাও। আমি খুব সামান্য পেলেও এখন বেঁচে যাই কানন। তুমি আমার গৃহিণী হও—হয়ত কালক্রমে—"

কানন বলিয়া উঠিল, "তা অসম্ভব নন্দবাবু—তা একবারেই অসম্ভব। আপনি আমার কাছে যা চাচ্ছেন—তার কণামাত্র আপনাকে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।"

নন্দবাবু বলিলেন, "এখনি না হোক—পরে যদি—"

কানন প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সারা জীবনেও তা

পারবো না নন্দবাবু। আপনি আমার মাফ্ করুন। আমার অপরাধ নেবেন না। আমি ত—জানতাম না নন্দবাবু। আমি যে কিছুই তখন বুঝতে পারিনি।"

নন্দলাল বাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবার পর বলিলেন, "তুমিই আমায় মাফ্ কর কানন। আমারই ভারি ভুল হয়ে গেছে। যদিও জিজ্ঞাসা করবার আমার কোনও অধিকার নেই—তুমি কি—আর কাউকে—"

কানন বলিল, "ও কথা জিজ্ঞাসা করবার আপনার খুব অধিকার আছে নন্দবাবু! আপনাকে আমি নিজের ভাইয়ের মত মনে করি।"—তাহার পর কানন অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে বলিল—"আপনি—যা অনুমান করেছেন—তাই ঠিক।"

"তিনি কোথায়?"

"বিলাতে। তিন মাস পরে ফিরে আসবেন।"

কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নন্দবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা কানন—এখন তবে আসি।"

কানন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "এখনি যাবেন?—কলকাতায় এখন আছেন ত?"

"না, কালই চলে যাব।"

"ফুলপুর যাবেন?"

"হ্যাঁ। সেখানে দুই একদিন থেকে, কাযকর্ম্ম সেরে আবার ভাওয়ালপুরে চলে যাব।"

"আবার কবে আসবেন ?"

"তা ঠিক নেই।"

কানন নিজ হাতখানি তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "বলুন নন্দবাবু, আমায় ক্ষমা করলেন ?"

নন্দবাবু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, সে হয়েছে। বিয়ের সময় আমায় খবর দিও—ভুলো না।"

কানন আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আসবেন নন্দবাবু ?"

"পারি যদি। এখন আসি তবে।"

কানন নীরবে তাঁহাকে সিঁড়ি অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

পরদিন ফুলপুরে ফিরিয়া নন্দলাল, বিনয় বাবুকে সব কথাই বলিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "বটে!—এ সবই তা হলে ঐ দেবাটার করসাজি। কাল রাত্রেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বল্লেন, দেবা এক সময় কাননকে বিয়ে করবার জন্যে মহা ক্ষেপেছিল,—কানন রাজি হয়নি—একটি ছেলের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই নাকি ওর ভাব, তাকে ছাড়া ও আর কাউকে বিয়ে করবে না। সেই ছেলেটিই বোধ হয় বিলেত গেছে।"

নন্দবাবু বলিলেন, "সম্ভব। সেই আক্রোশে, নিজে না পেলে নাই পা'ক, তার বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে সমাজে তাকে অপদস্থ করবার মৎলবেই, দেবা বোধ হয় এই ফন্দিটি এঁটেছিল।"

পরদিন বিনয় বাবু বলিলেন, "ওহে, আজ আমি একটি মেয়ে দেখে এলাম, দিব্যি চেহারা। আর বয়সও ১৫।১৬—ও তোমার

কাননবালা কোথায় লাগে তার কাছে! যতই যা বলনা কেন, কাননবালার রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—তার বেশী নয়। এবার যেটি দেখে এলাম, যেমন মুখ চোখ, তেমনি গড়ন, টক্ টক্ করছে রঙ— যেন ইহুদীদের মেয়ে। বংশও ভাল। আমি তোমার কথা বলাতে তারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। বীরপুরের বাঁড়ুয্যেরা আর কি। উঁচু বংশ, কিন্তু এখন অবস্থা খারাপ! সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে ফেল ভায়া। গতস্য শোচনা নাস্তি - ওসব যা হয়েছে ভুলে টুলে যাও।”

নন্দলাল বলিলেন, “না ভাই, সে আমি পারবো না। আর না।”

দুইদিন ধরিয়া বিনয় বাবু নন্দলালকে অনেক জপাইলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। নন্দলাল ভাওয়ালপুর চলিয়া গেলেন।

পর বৎসর কাননবালার বিবাহ-সভায় দেখা গেল, রাশিকৃত উপহার দ্রব্যের সহিত, বহুমূল্য কিংখাবে বাঁধানো, সোণার ক্লাচ্ দিয়া আঁটা একখানি পুস্তক। বহিখানির বাহ্য সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নিমন্ত্রিতগণ সকলেই সেখানিকে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন। সুন্দর পার্চ্চমেণ্ট কাগজে উজ্জ্বল কালিতে ছাপানো ফার্সী কবিতা। কেহই তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিলেন না। হাইকোর্টের জনৈক মুসলমান উকীল অবশেষে সেখানির পাঠোদ্ধার করিয়া বলিলেন—“এগুলি প্রেমের কবিতা। নূতন কবিতা বলিয়াই বোধ হইতেছে—কখনও পড়ি নাই। রচয়িতার নামও ইহাতে ছাপা নাই; একটা ছদ্মনাম মাত্র আছে—তাহার অর্থ—ব্যথাতুর।”

মাষ্টার মহাশয়

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে, বর্দ্ধমান সহর হইতে ষোল ক্রোশ দূরে, দামোদর নদের অপর পারে, নন্দীপুর ও গোঁসাইগঞ্জ নামক পাশাপাশি ছুইটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; এবং উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর একটি প্রাচীন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। এখন সে গ্রাম দু'খানিও নাই, বট বৃক্ষটিও অদৃশ্য—দামোদরের বন্যা সে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

ফাল্গুন মাস; এক প্রহর বেলা হইয়াছে। গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর প্রজা এবং গ্রামের অভিভাবক-স্থানীয় কায়স্থ সন্তান শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস দত্ত মহাশয় হুঁকা হাতে করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। প্রতিবেশী শ্যামাপদ মুখুয্যে ও কেনারাম মল্লিক (ইঁহারাও বড় প্রজা) নিকটে বসিয়া, এ বৎসর চৈত্রমাসে বারোয়ারী অন্নপূর্ণা পূজা কিরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী নন্দীগ্রামেও প্রতি-বৎসর চাঁদা করিয়া ধুমধামের সহিত অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে। এ বৎসর গুজব শুনা যাইতেছে, উহারা অন্যান্য বৎসরের মত যাত্রা ত আনিবেই, অধিকন্তু কলিকাতায় কোনও টপওয়ালীকেও বায়না দিয়া আসিয়াছে। টপ সঙ্গীত এ অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই। এ গুজব যদি সত্য হয়, তবে গোঁসাই-

গঞ্জেরও শুধু যাত্রা আনিলে চলিবে না, ঢপ আনিতে হইবে। উহারা কোন্ ঢপওয়ালীকে বায়না দিয়াছে, সেই গোপন সংবাদটুকু সংগ্রহ করিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার নামটি 'সঠিক' জানিতে পারিলে, বর্দ্ধমানে অথবা কলিকাতায় গিয়া খবর লইতে হইবে সেই ঢপওয়ালী অপেক্ষা কোন্ ঢপওয়ালী সমধিক খ্যাতিসম্পন্না, এবং সেই বিখ্যাত ঢপওয়ালীকে গাওনা করিবার বায়না দিতে হইবে,—ইহাতে যত টাকা লাগে লাগুক্। কারণ গোঁসাইগঞ্জবাসিগণের একবাক্যে ইহাই মত যে, তিন পুরুষ ধরিয়া গোঁসাইগঞ্জ কোনও বিষয়েই নন্দীপুরের নিকট হটে নাই এবং আজিও হটিবে না।

আগামী বারোয়ারী পূজা সম্বন্ধে যখন গ্রামস্থ তিনজন প্রধান ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত প্রকার গভীর ও গূঢ় আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় রামচরণ মণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং হাতের লাঠিটা আছড়াইয়া ফেলিয়া ধপাস করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হীরুদত্ত সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে মোড়লের পো, অমন করে বসে পড়লে কেন? কি হয়েছে?"

রামচরণ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন দত্তজা, কি হতে আর বাকী আছে? হায় হায় হায়—কার্ত্তিক মাসে যখন আমার জ্বরবিকার হয়েছিল, তখনই আমি গেলাম না কেন? এই দেখবার জন্যে কি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলি হারে বিধেতা তোর পোড়া কপাল!"

শ্যামাপদ ও কেনারামও ঘোর দুশ্চিন্তায় রামচরণের পানে চাহিয়া রহিলেন। দত্তজা বলিলেন, "কি হয়েছে, কি হয়েছে? সব কথা খুলে বল। এখন আসছ কোথা থেকে?"

দীর্ঘশ্বাস-জড়িত স্বরে রামচরণ উত্তর করিল, "নন্দীপুর থেকে। হায় হায়, শেষকালে নন্দীপুরের কাছে মাথা হেঁট হয়ে গেল! হা—রে কপাল!"—বলিয়া রামচরণ সজোরে নিজ ললাটে করাঘাত করিল।

দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কেন? নন্দীপুরওয়ালারা কি করেছে?

"বল্‌ছি। বলবার জন্যেই এসেছি। এই রোদ্দুরে মশাই, এক কোশ পথ ছুটতে ছুটতে এসেছি। গলাটা শুকিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্চে না। এক ঘটি জল—"

দত্তজার আদেশে অবিলম্বে এক ঘড়া জল এবং একটি ঘটি আসিল। রামচরণ উঠিয়া রোয়াকের প্রান্তে বসিয়া, সেই জলে হাত পা মুখ ধুইয়া ফেলিল; কিঞ্চিৎ পানও করিল। তার পর হাত মুখ মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া বসিয়া, গভীর বিষাদে মাথাটি ঝুঁকাইয়া রহিল।

হীরু দত্ত বলিলেন, "এবার বল কি হয়েছে, আর দগ্ধে মেরো না বাপু!"

রামচরণ বলিল, "কি হয়েছে? যা হবার নয় তাই হয়েছে। বড় বড় সহরে যা হয় না, নন্দীপুরে তাই হয়েছে। এ সব

পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনও যা স্বপ্নেও ভাবেনি, তাই হয়েছে। তারা হুস্কুল বসিয়েছে।”

তিন জনেই সমবেত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি আবার? হুস্কুল কি?”

রামচরণ বলিল, “আরে ছাই আমিই কি জানতাম আগে হুস্কুল করে নাম? আজ না শুন্‌লাম! ইঞ্জিরি পড়ার পাঠ-শালাকে হুস্কুল বলে।”

দত্তজা বলিলেন, “ওঃ—ইস্কুল খুলেছে বুঝি?”

“হঁ্যা গো হঁ্যা—তাই খুলেছে। একজন ম্যাষ্টার নিয়ে এসেছে। ইঞ্জিরি পাঠশালের গুরু মশায়কে নাকি ম্যাষ্টার বলে। দাশু ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে হুস্কুল বসেছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম, ম্যাষ্টার বসে’ দশ বারোজন ছেলেকে ইঞ্জিরি পড়াচ্চে।”

হীরুদত্ত একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাষ্টার কোথা থেকে এনেছে তা কিছু শুনলে?”

“সব খবরই নিয়ে এসেছি। বর্দ্ধমান থেকে এনেছে। বামুনের ছেলে—হারাণ চক্রবর্ত্তী। পনেরো টাকা মাইনে, বাসা, খোরাক। সব খবরই নিয়ে এসেছি।”

বাহিরে এই সময়ে একটা কোলাহল শুনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল, পিল্‌পিল্‌ করিয়া লোক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। রামচরণ পথে আসিতে আসিতে, নন্দীপুরের হস্তে গোঁসাইগঞ্জের এই অভূতপূর্ব্ব পরাভব সংবাদ প্রচার করিয়া

আসিয়াছিল। সকলে আসিয়া চীৎকার করিয়া নানা ছন্দে বলিতে লাগিল, "এ কি সর্ব্বনাশ হল! নন্দীপুরের হাতে এই অপমান! আমাদের ইস্কুল খোলবার এখন কি উপায় হবে?"

হীরুদত্ত সেই রোয়াকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া, হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

"ভাই সকল! তোমরা কি মনে করেছ, তিন পুরুষ পরে আজ গোঁসাইগঞ্জ নন্দীপুরের কাছে হটে যাবে? কখনই না। এ দেহে প্রাণ থাকতে নয়। আমরাও ইস্কুল খুলবো। ওরা বা কী ইস্কুল খুলেছে, আমরা তার চতুর্গুণ ভাল ইস্কুল খুলবো। তোমরা শান্ত হয়ে ঘরে যাও। আজই খাওয়া দাওয়া করে' আমি বেরুচ্চি। কলকাতা যাবার রেল খুলেছে আর ত কোনও ভাবনা নেই। আমি কলকাতায় গিয়ে ওদের চেয়েও ভাল মাষ্টার নিয়ে আসবো। ওরা ১৫৲ দিয়ে মাষ্টার এনেছে? আমরা ২৫৲ মাইনে দেবো। ওদের মাষ্টারকে পড়াতে পারে এমন মাষ্টার আমি নিয়ে আসবো। আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে, আমার এই চণ্ডীমণ্ডপে ইস্কুল বসাবো বসাবো বসাবো—তিন সত্যি করলাম। এখন যাও তোমরা বাড়ী যাও, স্নানাহার করগে।"

"জয় গোঁসাইগঞ্জের জয়! জয় হীরু দত্তের জয়!"—সোল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে তখন সেই জনতা প্রস্থান করিল।

২

কলিকাতা হইতে মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া হীরু দত্ত চতুর্থ দিবসে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মাষ্টার মহাশয়ের নাম ব্রজগোপাল মিত্র। বয়স ত্রিশ বৎসর, খর্ব্বাকার কৃষকায় ব্যক্তি, বড় মিষ্টভাষী। ইংরাজি বলিতে কহিতে লিখিতে পড়িতে তিনি নাকি ভারি ওস্তাদ। ইংরাজিটা তাঁর এতই বেশী অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে মাঝে মাঝে ইংরাজি কথা মিশাইয়া ফেলেন—অজ্ঞ লোকের সুবিধার্থ আবার তাহা বাঙ্গলা করিয়া বুঝাইয়াও দেন। বলেন, পূর্ব্বে পিতার জীবিতকালে, একদিন কলিকাতার গঙ্গার ধারে মাষ্টার মহাশয় নাকি বেড়াইতেছিলেন, তথায় এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। সাহেব তাঁহার ইংরাজি শুনিয়া, লাট সাহেবের নিকট সে গল্প করিয়াছিলেন। লাট সাহেব মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া, ডেপুটি কালেক্টারি পদ তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তিনি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা ছিল না. সেই প্রস্তাব তিনি বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আজ অভাবে পড়িয়া এই ২৫৲ টাকার চাকরি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল! পুরুষস্ত ভাগ্যং!—মাষ্টার মহাশয়ের মুখে এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ইংরাজিয়ানা চাল চলন দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

হীরু দত্তের প্রতিজ্ঞা অনুসারে, পরদিনই ইস্কুল খুলিল। পনেরো যোলটি ছাত্র লইয়া মাষ্টার মহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা হইতে (দত্তজার ব্যয়ে) তিনি প্রচুর পরিমাণে সেলেট, পেন্সিল ও মরে সাহেবের স্পেলিং বুক পুস্তক খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন, ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সেগুলি তাহাদিগকে বিনামূল্যেই দেওয়া হইতে লাগিল।

গোঁসাইগঞ্জের লোকের সঙ্গে নন্দীপুরের লোকের পথে ঘাটে দেখা হইলে, উভয় গ্রামের মাষ্টার সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গোঁসাইগঞ্জ বলিত—"বর্দ্ধমানের মাষ্টার, ও জানেই বা কি, আর পড়াবেই বা কি!" নন্দীপুর বলিত—"হলেই বা আমাদের মাষ্টারের বর্দ্ধমানে বাড়ী, তিনিও ত কলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। ওঁরা যখন পড়তেন, তখন কি বর্দ্ধমানে ইংরিজি ইস্কুল ছিল? কলকাতায় গিয়ে ইংরিজি পড়তে হত।"

যথা সময়ে উভয় গ্রামের বারোয়ারী পূজার উৎসব আরম্ভ হইল। উভয় গ্রামই উভয় গ্রামের লোকদিগকে প্রতিমা দর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ, যাত্রা ও ঢপ সঙ্গীত শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিল। এই উপলক্ষে উভয় মাষ্টারের দেখা সাক্ষাৎ হইয়া গেল এবং সভাস্থলে প্রকাশ পাইল, উভয়ে পূর্ব্বাবধি পরিচিত।

পূজান্তে গোঁসাইগঞ্জ একটা কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নন্দীপুরের মাষ্টার নাকি বলিয়াছেন—"ঐ বেজা বুঝি ওদের মাষ্টার হয়ে এসেছে, তা এদ্দিন জানতাম না! ওটা ত মহামূর্খ! ছেলেবেলায় কলকেতায় আমরা এক কেলাসে পড়তাম

কি না। আমরা যখন সেকেন বুক পড়ি, সেই সময়েই ও ইস্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর আর ত ও ইংরেজি পড়েনি। বড়বাজারে এক মহাজনের আড়তে খাতা লিখ্‌ত, মাইনে ছিল সাত টাকা। গেল বছরও ত কলকাতায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়; তখনও ত ঐ চাকরি করছে।"

গোঁসাইগঞ্জবাসীরা ব্রজ মাষ্টারকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি শুনছি?"

ব্রজ মাষ্টার এ প্রশ্ন শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"একেই বলে কলিকাল। সেকেন বুক পড়ার সময় আমি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিলাম, না ও-ই ছেড়ে দিয়েছিল? হয়েছিল কি জাননা বুঝি? মাষ্টার কেলাসে রোজ পড়া জিজ্ঞাসা করতো, ও একদিনও বলতে পারতো না। মাষ্টার একদিন ওকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে, ও এন্‌সার করতে পারলে না। আমায় জিজ্ঞাসা করতেই আমি বল্লাম। মাষ্টার আমায় বল্লে, 'দাও ওর কাণ মলে।' আমি কাণ মলে দিতেই, ওর মুখচোখ রাগে রাঙা হয়ে গেল। ও বলতে লাগলো, আমি হলাম বামুনের ছেলে, ও কায়েত হয়ে কি না আমার কাণে হাত দেয়! সেই অপমানে ও-ই ত ইস্কুল ছেড়ে দিলে। আমি তার পর পাঁচ ছ' বছর সেই ইস্কুলে পড়ে, একেবারে লায়েক হয়ে তবে বেরুলাম।"

অতঃপর গোঁসাইগঞ্জের লোক, নন্দীপুর কর্ত্তৃক ব্যক্ত ঐ অপবাদের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে হারাণ মাষ্টার বলিল, "আমরা ইস্কুলে যে মাষ্টারের কাছে পড়তাম, তিনি আজও

বেঁচে আছেন। গোঁসাইগঞ্জ থেকে তোমরা দুজন মাতব্বর লোক আমার সঙ্গে চল তাঁর কাছে; তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখ কার কথা সত্যি কার কথা মিথ্যে।"

এ কথা শুনিয়া ব্রজ মাষ্টার হাস্য করিয়া হাসিয়া বলিল, "অ্যাঁ! এই কথা বলেছে? ও সব ত বিলকুল ফল্‌সো—মিথ্যে কথা। সেই মাষ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে ভজিয়ে দেবে? তিনি কি আর বেঁচে আছেন? গেল বছরের আগের বছর, তিনি যে হেভেন—স্বর্গে গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে আমি ইনভাইট—নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি বেশ মনে আছে। আমাকে বড্ড ভালবাসতেন যে! একেবারে সন্ ইকোয়েল—পুত্রতুল্য। তাঁর ছেলেরা আজও আমায় বেজো দাদা বলতে ইগ্নোরেণ্ট—অজ্ঞান।"

উভয় মাষ্টারের পরস্পরের প্রতি এই তীব্র অপবাদ-প্রয়োগের ফল এই হইল, উভয় গ্রামই স্ব স্ব মাষ্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

অবশেষে স্থির হইল, কোনও প্রকাশ্য স্থানে দুই জনের মধ্যে বিচার হউক, কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে দেখা যাউক।

উভয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন, উভয় গ্রামের সীমারেখার উপর যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহারই নিম্নে বিচার সভা বসিবে। কিন্তু উভয় গ্রামের লোকেই ইংরাজিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং যাহাতে জয় পরাজয় সম্বন্ধে কাহারও মনে কিছুমাত্র সংশয় না থাকে, এমন একটি সরল বিচার প্রণালী স্থির করা আবশ্যক। উভয় গ্রামের

সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, মাষ্টারেরা পরস্পরকে একটি ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিবে, অপরকে তাহার মানে বলিতে হইবে। যদি উভয়েই বলিতে পারেন, তবে উভয়ে তুল্যমূল্য। একজন অন্যকে ঠকাইতে পারিলে, তিনিই জয়পত্র পাইবেন।

বিচারের দিন স্থির হইল—আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা; স্থান—উপরিউক্ত বটবৃক্ষ তল; সময়—সূর্য্যাস্ত।

৩

ধার্য্যদিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই গোঁসাইগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তিগণ ব্রজমাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া বটবৃক্ষ অভিমুখে শোভাযাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঢাক ঢোল কাড়া নাগারা প্রভৃতি বাদ্যকরগণ আছে এবং এক ব্যক্তি একটা বৃহৎ রামশিঙ্গা লইয়া চলিয়াছে—ঈশ্বরেচ্ছায় যদি জয় হয়, তবে ঢাক ঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পথে যাইতে যাইতে ব্রজ মাষ্টারের পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন—"কি হে মাষ্টার, মুখ রাখতে পারবে ত? বেছে বেছে খুব শক্ত একটা কিছু ঠিক করে রাখ, হারাণ মাষ্টার যেন কিছুতেই তার মানে বলতে না পারে।" ব্রজ বাবু বলিলেন, "আপনারা ভাবছেন কেন? দেখুন না কি করি! এমন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করব যে তা শুনেই হারাণ মাষ্টারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে—মানে বলা ত দূরের কথা!" দত্তজা বলিলেন, "দেখো ভায়া, আজ যদি মুখ রাখতে পার,

তবে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।"—কেহ স্পষ্ট না বলিলেও ব্রজ মাষ্টার ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে, আজ যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে, তবে এ গ্রাম কল্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই গোঁসাইগঞ্জের দল বটবৃক্ষতলে উপনীত হইল। শপ্, মাদুর, শতরঞ্চি প্রভৃতি বাহকেরা তৎপূর্ব্বেই আসিয়া, নিজ গ্রামের সীমা-রেখার নিকট সেগুলি বিছাইয়া রাখিয়াছে। দূরে পঙ্গপালের মত নন্দীপুরবাসিগণ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সঙ্গেও শপ্, মাদুর প্রভৃতি ও ঢাক, ঢোল ইত্যাদি আসিতেছে।

ক্রমে নন্দীপুর আসিয়া নিজ সীমানার নিকট শপ্ মাদুর বিছাইয়া বসিয়া গেল। উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মুখে বসিয়াছেন, মধ্যে দুই তিন হাত মাত্র খালি জমি।

এখন প্রশ্ন উঠিল, কোন্ মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবেন। উভয় গ্রামই প্রথম জিজ্ঞাসার অধিকার দাবী করিল। কোনও পক্ষই নিজ দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত নহে। অবশেষে বৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিলেন, হীরু দত্ত মহাশয় একটা ছড়ি ঘুরাইয়া উর্দ্ধে ছুড়িয়া দিউন, ছড়ি যে গ্রামের অভিমুখে মাথা করিয়া পড়িবে, সেই গ্রামের মাষ্টার প্রথমে মানে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইবেন।

"আমার ছড়ি লউন—আমার ছড়ি লউন" বলিয়া উভয় উভয় গ্রামের অনেকেই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাছে যে ছড়িটি

পাইলেন, তাহা লইয়া হীরু দত্ত সজোরে ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন।

ক্রমে ছড়ি আসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সকলে দেখিল, তাহার মাথাটি নন্দীপুরের দিক হেলিয়া রহিয়াছে।

নন্দীপুর ইহা দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল; গোঁসাই-গঞ্জের মুখটি চূর্ণ হইয়া গেল। সকলে সাগ্রহে বিচার ফলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

নন্দীপুরের হারাণ মাষ্টার তখন বুক ফুলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজ মাষ্টারও উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে সে ভাবকে তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না।

হারাণ মাষ্টার তখন বলিলেন, "আচ্ছা, বল দেখি, এর্ মানে কি—

HORNS OF A DILEMMA

সৌভাগ্যক্রমে ব্রজ মাষ্টার এই কূটপ্রশ্নের অর্থ অবগত ছিলেন। তিনি বুক ফুলাইয়া, সহাস্য বদনে বলিলেন, "এর মানে—

উভয়-সঙ্কট

—কেমন কি না?"

"পেরেছে—পেরেছে—আমাদের মাষ্টার পেরেছে"—বলিয়া গোঁসাইগঞ্জ তুমুল কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। দলপতিগণ

অনেক কষ্টে তাহাদের থামাইলেন। এখন ব্রজ মাষ্টারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা আসিল।

ব্রজ মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"শোন হারাণ বাবু, আমি তোমায় কোনও কঠিন প্রশ্ন করতে চাইনে, বরং খুব সহজ দেখেই একটা জিজ্ঞাসা করব। এ অঞ্চলে, মনে কর, তুমি আর আমি এই দু'জন যা ইংরেজিনবীশ আছি। একটা শক্ত কথার মানে জিজ্ঞাসা করে' তোমায় ঠকিয়ে দেবো, সেটা আমার মনঃপূত নয়। এতে হয়ত গোঁসাইগঞ্জ রাগ করতে পারেন—কিন্তু আমি নিজে একজন ইংরেজিনবীশ হয়ে, আর এক-জন ইংরেজিনবীশের প্রকাশ্য সভায় অপমান ত করতে পারিনে! আচ্ছা, খুব সহজ একটা কথার মানে জিজ্ঞাসা করি—বেশ হেঁকে উত্তর দাও, যাতে দুই গ্রামের সকলে শুনতে পায়। আচ্ছা এর মানে কি বল দেখি—তুমি জান নিশ্চয়ই—আচ্ছা এর মানে বল—

I DONT KNOW.

হারাণ মাষ্টার উচ্চস্বরে বলিল—

"আমি জানি না।"

শ্রবণমাত্র নন্দীপুরের সকলের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সেই মুহূর্ত্তে গোঁসাইগঞ্জর দল একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিপুল বেগে নৃত্য ও চীৎকার করিতে লাগিল—"হো হো জানে না—নন্দীপুর জানে না—হেরে গেল দুও—দুও।"

হারাণ মাষ্টার মহা বিপন্ন ভাবে সকলকে কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় গোঁসাইগঞ্জের ঢাক ঢোল কাড়া নাগারা ও রামশিঙ্গা সমবেত ভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাঁহার কথা আর কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

গোঁসাইগঞ্জ-নিবাসী কয়েকজন বলশালী লোক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং তন্মধ্যে একজন ব্রজ মাষ্টারকে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে, বাদ্যভাণ্ডের সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন শুনা গেল হারাণ মাষ্টার নন্দীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তথায় স্কুলটি বন্ধ হইয়া গেল। গোঁসাইগঞ্জে ব্রজ মাষ্টার অপ্রতিহত প্রভাবে মাষ্টারি এবং গ্রামস্থ সকলের অপত্য নির্ব্বিশেষে ক্ষীর ননী ছানা ভুঞ্জন করিতে লাগিলেন।

নয়নমণি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আশ্বিন মাস, বেলা ৯টা বাজিয়াছে। আকাশে মেঘ করিয়া রহিয়াছে। কাশী, বাঙ্গালীটোলায় একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গৃহে, দ্বিতলের রন্ধনশালায় ১৫।১৬ বৎসর-বয়স্কা একটি মেয়ে, বঁটি পাতিয়া বসিয়া কুটনা কুটিতেছে। মেয়েটি সুন্দরী। চোখ দু'টি বেশ ডাগর, কিন্তু যেন বড় বিষণ্ণ। পরিধানে একখানি চৌড়া লাল পাড় শাড়ী। স্নান হইয়া গিয়াছে, আর্দ্র কেশগুলির অধিকাংশ পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া রহিয়াছে, দুই চারি গুচ্ছ স্কন্ধ বেড়িয়া সম্মুখে আসিয়া বক্ষের নিকট দুলিতেছে। দুই হাতে দুইগাছি ডায়মণ কাটা সোণার বালা, আর কতকগুলি রেশম চুড়ি। বাঁ হাতে একটি সোণা বাঁধানো "সাবিত্রী লোহা"। উপর হাতে দুই গাছি আঙুর পাতা প্যাটার্ণ কুকুরমুখো তাগা, গলায় একগাছি ছোট চেন-হার।

মেয়েটি কুটনা কুটিতেছে। অদূরে চুল্লীর উপর পিতলের কড়াইয়ে সেরখানেক দুধ চড়ানো আছে। কয়লাগুলি এখনও ভাল করিয়া ধরিয়া উঠে নাই, অল্প অল্প ধূম বাহির হইতেছে। একে মেঘ করিয়া গুমট হইয়া রহিয়াছে, ছোট ঘরখানিতে উনান-ভরা কয়লা পুড়িতেছে—মেয়েটির কপালে ক্রমে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। দ্বারের বাহিরে একটি শাদা বিড়াল চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ

হইয়া বসিয়া আছে। মেয়েটি কুটনা কুটিতে কুটিতে এক একবার তাহার সেই বিষণ্ণ আয়ত চক্ষু দুটি তুলিয়া উন্মুক্ত দ্বারপথে বিপরীত দিকের বারান্দা পানে চাহিতেছে; তথায় কম্বলের উপর তাহার বৃদ্ধ পিতা বসিয়া আপন মনে হরিনামের মালা ফিরাইতেছেন।

আলু বেগুন উচ্ছে ও কাঁচকলাগুলি কোটা হইয়া গেল। মেয়েটি তখন উঠিয়া, একটি ভাঙ্গা পাখা লইয়া চুল্লীর মুখে মৃদু মৃদু বাতাস দিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কয়লাগুলি গণ্ গণ্ করিয়া ধরিয়া উঠিল। এমন সময় বারান্দা হইতে বৃদ্ধ হাঁকিলেন —"নয়ন।"

মেয়েটির নাম নয়নমণি। "কেন বাবা?"—বলিয়া সে দ্বারের বাহিরে গেল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "একটু তামাক সেজে দিতে পার মা?"

"দিই বাবা"—বলিয়া নয়নমণি ক্ষিপ্রপদে অপর বারান্দায় পিতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। তথা হইতে আবশ্যক উপকরণগুলি লইয়া আবার রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়া তামাক সাজিতে বসিল। দুধটুকু ইতিমধ্যে ফুটিয়া উঠিল। নয়ন তখন তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ফেলিয়া, হাতা দিয়া দুধ নাড়িতে লাগিল।

ওদিকে তামাকু-পিয়াসী বৃদ্ধ অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। হাঁকিলেন—"তামাক সাজা হল?"

"যাই বাবা"—বলিয়া নয়নমণি কলিকাটি উঠাইয়া লইয়া ফুঁ দিতে দিতে পিতার নিকট উপস্থিত হইল। হুঁকাটি দ্বারের কোণে দাঁড় করানো ছিল, তাহাতে কলিকাটি বসাইয়া পিতার হস্তে দিল।

বৃদ্ধ ধূমপান করিতে লাগিলেন। নয়ন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার হরিনাম হয়েছে বাবা?"

"হয়েছে।"

"দুধও জ্বাল হয়েছে। নিয়ে আসি?"

"দাঁড়াও, তামাকটা আগে খেয়ে নিই।"

"আচ্ছা, আমি ততক্ষণ দুধটুকু জুড়োতে দিইগে বাবা।"—বলিয়া নয়ন রান্নাঘরে চলিয়া গেল। বৃদ্ধ বসিয়া আরামে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

এই বৃদ্ধের নাম হরিকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, নিবাস যশোহর জিলার দুর্জ্জাপুর গ্রামে। পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট আপিসে চাকরি করিতেন, দশ বৎসর পেন্সন ভোগ করিতেছেন। ইঁহার পুত্র নাই; তিন কন্যা—রতনমণি, গৌরমণি, এবং এই নয়নমণি। বড় এবং মেঝ মেয়ে বিধবা,—ইঁহার নিকটেই থাকে। ছোট মেয়ে সধবা হইয়াও বিধবা; বিবাহ হইবার এক বৎসর পরে ইহার স্বামী কোথায় পলাইয়া গিয়াছে; অদ্যাবধি তাহার কোনও খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। সে আজ চারি বৎসরের কথা। ইহার কয়েকমাস পরে, বুড়ার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। এই সকল ব্যাপারে মনের দুঃখে হরিকিঙ্কর দেশের বাড়ী বাগান জমিজমা বিক্রয় করিয়া, কাশীতে এই বাড়ীখানি কিনিয়া, মেয়ে তিনটিকে লইয়া আজ তিন বৎসর কাশীবাস করিতেছেন।

নয়নমণি কড়াই নামাইয়া, সেই ফুটন্ত দুধ হাতায় করিয়া একটি বড় পাথরের খোরায় ঢালিতে লাগিল। পোয়া দেড়েক দুধ লইয়া,

কড়াইটি সরাইয়া, তারের 'ঢাকা' চাপা দিয়া একটি কোণে রাখিল। খোরাটি অল্প অল্প হেলাইয়া, পাখার বাতাস করিয়া, দুধটুকু জুড়াইল। পরে একটি কাঁসার বাটিতে সেটুকু ঢালিয়া পিতার নিকট লইয়া গেল।

বৃদ্ধ দুগ্ধ পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক'টা বাজল ?"

নয়ন একটু সরিয়া, পিতার শয়ন ঘরের দেওয়ালে সংলগ্ন ক্লকটির পানে চাহিয়া বলিল, "সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। প্রায় পৌনে দশটা।"

"উঃ—এত বেলা হয়েছে! আকাশটা মেঘলা করে রয়েছে কি না, তাই বেলা বোঝা যাচ্চে না।"—বলিয়া তিনি দুগ্ধটুকু নিঃশেষিত করিলেন।

নয়নমণি জল লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পিতার হাত মুখ ধোয়াইয়া তাঁহাকে গামছা দিল।

হাত মুছিতে মুছিতে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা, এত বেলা হয়ে গেছে, দশটা বাজে, রতনমণি গৌরমণি এখনও স্নান করে' ফিরলো না কেন? এত দেরী ত কোনও দিন হয় না।"

"ফিরবে এখনি, বোধ হয় কোথাও ঠাকুর টাকুর দেখতে গেছে"—বলিয়া নয়নমণি পিতার জন্য পাণ আনিতে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দশাশ্বমেধ ঘাটে শত শত নরনারী—বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মারহাট্টি, মাড়োয়ারী—স্নান করিতেছে। বৃদ্ধগণ উচ্চৈস্বরে স্তব পাঠ করিতে করিতে জল হইতে উঠিয়া আসিয়া, শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া, প্রস্তর সোপানে আহ্নিক করিতে বসিতেছেন। অনেকে ঘাটওয়ালাদের নিকট গিয়া দুই এক পয়সা দিয়া, কপালে ফোঁটা তিলক লইয়া প্রস্থান করিতেছে।

রতনমণি ও গৌরমণি স্নানান্তে ঘাট হইতে উঠিল। রতনের বয়স চল্লিশ হইয়াছে, গৌরমণি যুবতী। উভয়ের বিধবা বেশ। রতনের শ্যামবর্ণ দেহখানির মধ্যে স্বাস্থ্য যেন টলমল করিতেছে, মাথার চুলগুলি পুরুষ মানুষের মত ছোট, ভ্রূযুগল-মধ্যে ক্ষুদ্র একটি উল্কির চিহ্ন, হাতে ভিজা গামছা। গৌরমণি ক্ষীণাঙ্গী, রঙটি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর, কক্ষে গঙ্গাজলপূর্ণ ছোট একটি পিতলের কলসী।

দশাশ্বমেধের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া, দুই বোনে কালীতলার দিকে চলিল। সেখানে তরকারীর বাজার বসিয়াছে। চলিতে চলিতে রতনমণি কোনও দোকান হইতে দুই ফালি বিলাতী কুমড়া, কোনও দোকান হইতে শাক, বেগুন প্রভৃতি কিনিয়া গামছা-খানিতে বাঁধিয়া লইতে লাগিল। বাজার করা শেষ হইলে, দুই বোনে বাঙ্গালীটোলার একটি গলি ধরিয়া চলিল।

কিছুক্ষণ চলিয়া সহসা উভয়ে পথের মাঝে দাঁড়াইল। সম্মুখে

অল্পদূরে একটি শিবমন্দির, তাহারই উচ্চ বারান্দায়, ভস্মমাথা দেহ এক সন্ন্যাসী বসিয়া ; নিম্নে পথের উপর, গলাখোলা কোট গায়ে এক বাঙ্গালী যুবক দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতেছে। দুই ভগিনী সেই যুবকটির পানে ক্ষণকাল চাহিয়া দেখিয়া, পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

রতনমণি মৃদুস্বরে বলিল, "হ্যাঁলা, ও কে বল্ দেখি ?"

গৌরমণি লোকটিকে আর এক নজর দেখিয়া উত্তর করিল, "আমাদের বিনোদ, না ?"

রতন বলিল, "সেই ত ! আমি ত দেখেই চিনেছি। আচ্ছা চল্ দিকিন, একটু এগিয়ে ভাল করে' দেখি।"

গৌরমণি বলিল, "নিশ্চয়ই সে-ই, দিদি। দেখছ না ঠিক সেই রকম মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে, হাত নেড়ে নেড়ে কথা কচ্চে—ও বিনোদই বটে।"

রতনমণি বলিল, "আচ্ছা চল্ না, একটু কাছে যাই। ওলো দেখ্ দেখ্, আমাদের পানে তাকাচ্চে, মুখ নীচু কল্লে। আমাদের চিনেছে বোধ হয়।"—বলিয়া রতনমণি দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

সন্ন্যাসী ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যুবক তাঁহাকে প্রণামান্তর বিদায় লইয়া, হন্ হন্ করিয়া বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। রতনমণি চীৎকার করিয়া উঠিল—"বিনোদ, ও বিনোদ—যাও কোথা ? বলি শোন শোন।"

যুবক তথাপি থামিল না। রতনমণি তখন প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতে উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল—"ওগো—ও কোট গায়ে

ত!"—কেহ বলিল, "বউ বোধ হয় পছন্দ হয়নি, তাই পালিয়েছে।"

যুবক গম্ভীরভাবে বলিল, "আপনি বল্‌ছেন আমি আপনার ছোট বোনকে বিয়ে করেছি?"

"শুধু আমি বলব কেন? গাঁ-শুদ্ধ লোক সবাই বলবে যে তুমি আমার বোন নয়নমণিকে আজ পাঁচ বছর হল বিয়ে করেছ।"

যুবক ক্ষণমাত্র কাল কি ভাবিল। তাহার পর, মুখের বিরক্ত-ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া, জনতার দিকে সহাস নয়নে একবার নেত্র-পাত করিয়া, ব্যঙ্গস্বরে বলিতে লাগিল, "ওঃ—তা জানতাম না। আমার ধারণা ছিল আমি অবিবাহিত। নামটি কি বল্লেন—নয়ন-মণি?—নামটি মিষ্টি বটে। তা, আমাকে ভগিনীপতি বলেই যদি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে, আমায় নিয়ে চলুন না, বেশ ত! নয়ন-মণি দেখতে কেমন বলুন দেখি—বয়সই বা কত?"—বলিয়া যুবক ঘাড় বাঁকাইয়া মৃদু হাস্য করিয়া রতনমণির দিকে চাহিল। জনতার মধ্য হইতেও হাসি টিটকারী শুনা গেল।

রতনমণি রাগে ফুলিতেছিল, তাহার নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছিল, প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত সে কথা কহিতে পারিল না। অবশেষে তীব্রস্বরে বলিল, "তোমার ও সব নেকামি রাখ বলছি! তুমি কি ভেবেছ ঐরকম ইয়ার্কির কথা বল্লেই আমি ভয় পেয়ে যাব, মনে করব কি জানি তা হলে এ বোধ হয় আমাদের সে বিনোদ নয়! (যুবকের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া) রত্নী বামনীর চোখে ধুলো দিতে পারে এমন মানুষ এখনও জন্মায়নি, বুঝলে?"

জনতার মধ্য হইতে একজন চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ—শক্ত ঘানি!"

যেদিক হইতে এই শব্দ আসিয়াছিল, সেই দিকে একবার সরোষ কটাক্ষ করিয়া রতনমণি যুবককে বলিল, "আচ্ছা তুমি যদি বিনোদ নও—তবে হাতটি একবার পাত দিকিন।"

যুবক বলিল, "কেন, হাত পাতব কেন? কিছু দেবেন না কি?"

"হ্যাঁ, দেবো। হাত পাত। ভাবছ কি? কোনও ভয় নেই, হাতটি পাত না। পাত পাত!"—জনতার মধ্যে ঔৎসুক্যবশতঃ একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল।

যুবক হাত পাতিল। রতন, ভগিনীর কলসী হইতে এক অঞ্জলি গঙ্গাজল লইয়া যুবকের হাতে দিয়া বলিল, "আচ্ছা, এইবার বল আমার নাম সুধীরচন্দ্র বসু, আমার নাম বিনোদ চাটুয্যে নয়।"

যুবক জল ফেলিয়া দিয়া, কোঁচার খুটে হাতটি মুছিতে মুছিতে রুষ্টভাবে বলিল, "আপনার ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করুন, না ইচ্ছে হয় না করুন। কাশীতে গঙ্গাজল হাতে নিয়ে আমি দিব্যি করতে যাব কেন?"

রতন বলিল, "হেঁহেঁ—এখন পথে এস ত চাঁদু! যা হোক, ধর্ম্ম-ভয়টা এখনও আছে দেখছি। আর কথা বাড়াচ্চ কেন, চল বাড়ী চল। সোমত্ত বউ তোমার, তাকে তুমি কি দোষে পরিত্যাগ করলে বল দেখি! দিনে রেতে চোখে তার জল শুকোয় না। সোণার অঙ্গখানি কালি হয়ে গেছে! বিশ্বাস না হয়, নিজের চোখে তাকে একবার দেখবে চল।"

যুবক বলিল, "দেখুন, এখন ত আমার সময় নেই। আপনারা এখন বাড়ী যান, ঠিকানাটা বরং বলে দিয়ে যান, আমি ওবেলা আসবো এখন। নদে' ছত্তর বল্লেন না? কত নম্বর?"

রতন ভেঙ্গাইয়া বলিল, "আর নম্বরে কায নেই! নম্বর জেনে নিয়ে ও-বেলা উনি আসবেন! আমায় কচি খুকীটি পেয়েছ কি না!"

জনতা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "ছেড় না বামুনগিন্নী, মৎবল ভাল নয়, ফাঁকি দেবে।"—একজন বখাটে যুবক গাহিয়া উঠিল—"ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল আর এল না—আ।"

ইহাদের প্রতি সরোষ কটাক্ষপাত করিয়া, যুবকের দিকে ফিরিয়া রতন স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "দেখ, ও সব চালাকি রাখ। ভাল চাও ত আমার সঙ্গে বাড়ী এস। নইলে আমি পুলিস ডাকবো তা কিন্তু বলে দিচ্ছি হাঁ!"

যুবক বলিল, "আমি এখন কিছুতেই আপনার সঙ্গে যেতে পারব না—আপনি পুলিসই ডাকুন আর যাই করুন।"—বলিয়া সে গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যদিও সেই ছোট গলি, তথাপি আগে পিছে আশে পাশে এতক্ষণে অন্ততঃ ১৫।২০ জন লোক জমা হইয়া পড়িয়াছিল। একজন বলিয়া উঠিল—"আহা যানই না মশাই, মেয়েমানুষটি কি রকম দেখেই আসুন না। হায় হায়, আমাদের কেউ ডাকে না রে!"

রতন দেখিল, এখানে দাঁড়াইয়া এমন করিয়া কথা কাটাকাটি

করিয়া আর কোনও লাভ নাই—জনতা বাড়িতেছে এবং তাহারা অপমানসূচক মন্তব্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধীরভাবে যুবকের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা আছ বল্লে?"

"অগস্ত্যকুণ্ডে—বিশ্বনাথ মিশনের সেবাশ্রমে। আপনি বিশ্বাস করুন, ও-বেলা আমি আসবো। এখন আমায় রেহাই দিন—দোহাই আপনার। দেখছেন ত!"—বলিয়া যুবক জনতার দিকে নেত্রপাত করিল।

রতন বলিল, "নিশ্চয় আসবে? আমরা থাকি ডি-২৬ নম্বর নদীয়া ছত্তরে। তিন সত্যি কর যে আসবে।"

যুবক বলিল, "তিন সত্যি করছি—আসবো, আসবো, আসবো। ও-বেলা ২টার সময় নদে' ছত্তরে আপনার ডি-২৬ নম্বর বাড়ীতে আসবো। আপনাদের বাড়ীতে অন্য লোকেরাও আছেন ত? তাঁরা বোধ হয় আমায় দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমি আপনাদের বিনোদ নই। তখন আমায় রেহাই দেবেন ত?"

রতন বলিল, "পরের কথা পরে হবে। আমি বিশ্বনাথ সেবাশ্রম চিনি। যদি না আস, পাঁচটার পর আমি কিন্তু সেখানে গিয়ে সোর হাঙ্গাম বাধিয়ে দেবো;—গলায় গামছা বেঁধে তোমায় হিড়হিড় করে' টেনে নিয়ে আসবো। রত্নী বামনী সোজা মেয়ে নয়!"

"আসবো আসবো। এখন বাড়ী যান।"—বলিয়া যুবক গমনোদ্যম করিল।

রতন বলিল, "আর একটা কথা। কোন্ দিকে মুখ করে রয়েছ বল দেখি?"

যুবক বলিল, "কেন ? দক্ষিণ দিক।"

"বাবা বিশ্বনাথের মন্দির এখান থেকে খাড়া দক্ষিণ। বাবার মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, আমি ব্রাহ্মণকন্তে আমার সমুখে তুমি তিন সত্যি করেছ—সেইটি মনে রেখ। আমি আর এ হাটের মাঝে দাঁড়িয়ে তোমায় কি বল্‌বো! এখন তুমি জান আর তোমার ধর্ম্ম জানে!"—শেষের কথাগুলি বলিতে বলিতে রতনের গলার স্বর যেন ভারি হইয়া উঠিল, তাহার চক্ষু দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল।

"ঠিক আসবো। ডি-২৬ নম্বর নদীয়া ছত্তর। প্রণাম।"—বলিয়া যুবক জনতা ভেদ করিয়া প্রস্থান করিল। দুই ভগিনীও বিষণ্ণ মনে গৃহাভিমুখে চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কন্যাদ্বয়ের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ হরিকিঙ্কর সন্দিগ্ধভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "আস্‌তে ত বল্লে, কিন্তু সে যদি বিনোদ না হয় ?"

রতনমণি গৌরমণি উভয়েই জোর করিয়া বলিল—সে যে বিনোদ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"কিন্তু, অত করে' তোমরা বল্লে, তবু শেষ পর্য্যন্ত নাম পরিচয় সে স্বীকার করচে না কেন ?"

রতন বলিল, "তা ত করবেই না, বাবা। তার মনে একটা বৈরাগ্য হয়েছিল, তাই না সে সংসার ছেড়ে পালিয়েছে! ভাবলে, এরা যদি এখন আমায় বিনোদ বলেই চিন্‌তে পারে, তা হলে ধরপাকড় আরম্ভ করবে—আবার কি শেষে সেই সংসার বন্ধনে বাঁধা পড়ে যাব! তাই মিথ্যে করে বল্‌ছে আমি সুধীর বোস্‌।"

বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন, "সাধু পুরুষ!—সংসার বন্ধনে বড় ভয়, কিন্তু মিথ্যেটি মুখে আটকায় না।"—কিন্তু তাঁহার এ ব্যঙ্গের ভাব অধিকক্ষণ রহিল না; আবার গম্ভীর ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

গৌরমণি বলিল, "আর একটা কথা ভেবে দেখুন বাবা! সত্যিই যদি সে সুধীর বোস্‌ হ'ত, তা হলে, দিদি যখন তার হাতে গঙ্গাজল দিয়ে বল্লে—'বল আমি সুধীর বোস, আমি বিনোদ নই'—তখন সে গঙ্গাজল ফেলে দিয়ে হাত মুছে ফেল্লে কেন?"

বৃদ্ধ ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "পাগলী! ওতেই কি প্রমাণ হল সে বিনোদ! কাশী হেন স্থান, এখানে গাঙ্গজল হাতে নিয়ে দিব্যি করে,' সত্যি কথা বল্‌তেও অনেকের আপত্তি থাকতে পারে। বেশ করে' ভেবে চিন্তে ত্থাখ্‌—শেষকালে চৌদ্দ পুরুষকে নরকে ডোবসনে যেন।"

পিতার এই অবিশ্বাসে রতন একটু চটিয়া, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমরা এত করে' বলছি তবু আপনার মনের সন্দেহ যাচ্চে না বাবা? আমাদেরই কি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই একবারে? আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি, সে বিনোদ।"

কন্যাকে কুপিত দেখিয়া হরিকিঙ্কর বলিলেন, "পাঁচ বছর আগে তোমরা তাকে দেখেছিলে—সেই বা ক'দিন? মাঘ মাসে বিয়ে হল, জষ্টি মাসের ষষ্ঠীবাটায় এসেছিল—তিনটি দিন ত মোটে ছিল। তার পর, জন্মাষ্টমীর ছুটিতে একবার এসেছিল। এক দিন না হু'দিন ছিল বুঝি?"

গৌর বলিল, "একদিন এক রাত ছিল।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তবেই ত বোঝ দিকিন! তিন দিন আর এক দিন—চার দিন, এই ত তার সঙ্গে তোমাদের পরিচয়। আমি বরঞ্চ তাকে তোমাদের চেয়ে বেশীবার দেখেছি। যখন ছেলে দেখতে গিয়েছিলাম, তার পর আশীর্ব্বাদের সময়, তার পর বিয়ের পর নয়নকে সেখান থেকে আনতে গিয়ে। সে যাই হোক, আসবে ত বলেছে—আসুক, দেখি।"

রতন বলিল, "আপনিও দেখলেই তাকে চিন্‌তে পারবেন বাবা! তবে আগেকার চেয়ে মাথায় একটু ঢেঙা হয়েছে, রঙটাও যেন একটু ফর্সা হয়েছে—পশ্চিমে রয়েছে কি না! কিন্তু সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গলার স্বর, সেই কথা ক'বার ভঙ্গি।"

পিতাকে সযত্নে আহার করাইয়া, নিজেরা খাইয়া, সংসারের কাযকর্ম্ম সারিয়া গৌর ও নয়ন পাশের ঘরটিতে গিয়া তিন বোনের জন্য তিনখানি মাদুর বিছাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিল। রতনমণি পিতাকে শোয়াইয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছিল, কিছুক্ষণ পরে পাণের ডিবা ও সুর্ত্তির কৌটা হাতে করিয়া সেও আসিয়া প্রবেশ করিল। নিজের মাদুরে বসিয়া দুই চারিটা অন্য কথার পর

বলিল, "নৈনি, তোর বাক্সে সেই যে সাবান ছিল সে কি আছে?"

নয়ন বলিল, "আছে। কেন দিদি?"

"বের করে রাখিস। আর এই চাবি নে, বাবার ঘরের আলমারি খুলে দুটো টাকা বের করে আন্ ত।"

গৌরমণি দিদির কৌটা হইতে দুইটি স্থর্ত্তিগুলি লইতে লইতে বলিল, "কেন দিদি? এখন টাকা কি হবে?"

রতন বলিল, "যাই, সরোজিনীর দেওরকে দিয়ে একটা রেজলী, আরও দুই একটা জিনিষ টিনিষ আনাই।"

গৌর জিজ্ঞাসা করিল, "রেজলী কি?"

নয়নমণিও কৌতূহলের সহিত দিদির মুখপানে চাহিয়া রহিল। রতন বলিল, "রেজলী জানিসনে! এই যে কাঁচের কৌটোতে থাকে, আজকালকার মেয়েরা সাবান টাবান মেখে, মুখে তাই মাখে—তাকে রেজলী বলে।"

একটু ভাবিয়া নয়নমণি বলিল, "রেজলী—না হেজলীন, বল? সেই শাদা দুধের মত—বেশ মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আছে? সেই হেজ-লীনের কথা বলছ বুঝি?"

রতন বলিল, "হ্যাঁ হাঁ হেজলীই বুঝি বলে!"

গৌরমণি হাসিতে লাগিল। বলিল, "হা-হা রেজলী! রেজলী কি! হেজলীনকে বলে রেজলী! দিদি যেন চণ্ড-তেলাকুচো রঙ! হা-হা!"

রতন বলিল, "যা যা—আর ঠাট্টা করতে হবে না। আমি সেকেলে মানুষ অতশত কি জানি! আমাদের আমলে ও-সব

ওঠেও নি, আমরা জানিওনে। আজ কালকার ছুঁড়িগুলো মুখে মাথে দেখতে পাই, তাই ভাবলাম যে একটা আনিয়ে নিই। যা-যা নয়ন, টাকা দুটো বের করে নিয়ে আয়।"

নয়নমণি উঠিল না, মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বসিয়া রহিল। রতন রাগিয়া নিজে উঠিয়া টাকা বাহির করিয়া, সরোজিনীদের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। সেই গলিতে কাছেই তাহারা থাকে।

প্রভাতের মেঘ-মেঘ ভাবটা কাটিয়া গিয়া এখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। গুমোটও কাটিয়া গিয়াছে—জানালা দিয়া ঝুরঝুর করিয়া শরতের মিষ্ট বাতাস আসিতেছে। গৌরমণি তাহার মাদুরখানি জানালার নিকট সরাইয়া লইয়া শয়ন করিল এবং অবিলম্বে ঘুমাইয়া গেল।

নয়নমণি শুইয়া রহিল, কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। সে কেবল আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। এত দিনের পর, বাবা বিশ্বনাথ মা অন্নপূর্ণা কি তাহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন? এতদিন ধরিয়া মনে মনে গোপনে সে যাহা প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে, আজ কি তাহা পূর্ণ হইবে?

কিন্তু—আবার মনে হইল, সত্যই কি তিনি? যদি তিনি না হন! দিদিরা দুইজনেই বলিতেছেন বটে, কিন্তু বাবা যে বিশ্বাস করিতেছেন না। কিন্তু বাবা ত দেখেন নাই, দিদিরা দেখিয়াছে। আচ্ছা, আসুন ত, নয়নও দেখিবে। বিবাহের পর শ্বশুরালয় গিয়া তিনটি দিন সেখানে থাকিয়া সে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে। জামাই ষষ্ঠীর সময় আসিয়াও তিনি তিনদিন ছিলেন—

আর একবার আসিয়াছিলেন সেই জন্মাষ্টমীর ছুটিতে। তিন আর তিনে ছয় আর একে সাত—এই সাত রাত্রি সে স্বামীকে কাছে পাইয়াছিল—কিন্তু লজ্জায় কখনও চোখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিতে পারে নাই। তবে দিনের বেলায়, আড়ালে থাকিয়া দুই চারিবার তাঁহাকে সে দেখিয়াছে—তাহাতেই স্বামীর মুখখানি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। সে মুখ কি ভোলা যায়? যথার্থই যদি তিনি হন, তবে "আমি অমুক নই আমি সুধীরচন্দ্র বসু" বলিলেই কি নয়নমণিকে তিনি ঠকাইতে পারিবেন? কখনই না। সে, দেখিলেই তাঁহাকে চিনিবে। এখন বাবা বিশ্বনাথের কৃপায়, সত্যই যদি তিনি হন—তবেই। নহিলে—পোড়া কপাল ত পুড়িয়াইছে!

আবার নয়নমণির এ কথাও মনে হইল—যদি তিনিই হন, অথচ কোন মতেই সে কথা স্বীকার না করেন, কিংবা আত্মপ্রকাশ করিয়াও, গৃহী হইতে—নয়নকে গ্রহণ করিতে—সম্মত না হন? নয়ন ভাবিল, "তবু ত তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইব! এই সহরেই তিনি রহিয়াছেন, তাহাও ত জানিয়া মনকে একটু স্থির করিতে পারিব। বড়দিদি মাঝে মাঝে গিয়া তাঁহার খবরটাও ত আনিয়া দিতে পারিবেন!"

এইরূপ নানা চিন্তায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। পাশে পিতার ঘরে ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া তিনটা বাজিল। নয়ন মনে মনে বলিল, "আর দু' ঘণ্টা। দু'ঘণ্টা পরে অদৃষ্টে কি আছে কে জানে!"

কিয়ৎক্ষণ পরে রতনমণি অঞ্চলে কয়েকটি প্রসাধন সামগ্রী লইয়া প্রবেশ করিল। দেওয়াল আলমারিতে সেগুলি সাজাইয়া রাখিয়া, গৌরমণিকে ডাকিতে লাগিল, "গৌরী, ওলো ওঠ ওঠ। বেলা যে পড়ে এল। নৈনিকে ওঠা, গা মুখ ধুইয়ে ওর চুলটুল বেঁধে দেবার জোগাড় গ্যাখ্‌। আমি ততক্ষণ কয়লায় আগুন দিইগে, একটু জলখাবার তৈরী করতে হবে ত!"

গৌরমণি উঠিয়া বসিল। একটি হাই তুলিয়া, আঙুলে তুড়ি বাজাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ক'টা বেজেছে?"

"চারটে বাজে প্রায়। একটু হাত চালিয়ে নে।"—বলিয়া রতনমণি চলিয়া গেল।

নয়নমণি পশ্চাৎ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। গৌরমণি তাহাকে নিদ্রিত মনে করিয়া, উঠিয়া তাহার পাশে গিয়া বসিল এবং গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে লাগিল, "নয়ন—ও নয়ন—ওঠ দিদি।"

নয়নমণি ফিরিয়া দিদির পানে চাহিল। গৌর বলিল, "ওঠ। সাবান কোথা আছে বের কর—চল, হাতটা মুখটা ধুইয়ে দিই। তার পর চুল বাঁধতে হবে—ওঠ।"

নয়ন বলিল, "থাক্ দিদি, চুল বেঁধে আর কি হবে?"

"বর আসছে যে!"—বলিয়া গৌরমণি আদরে ভগিনীর চিবুক স্পর্শ করিল।

নয়ন উঠিয়া মুখখানি নীচু করিয়া বলিল, "কার বর তাই বা কে জানে!"

গৌরমণি চটিয়া বলিল, "বাবার সঙ্গে তুইও ঐ সুর ধরলি?

দিদি বল্‌ছে সে-ই, আমি বল্‌ছি সে-ই ; যারা দু'জন দেখেছে তারা বল্‌ছে সে-ই ; আর তোরা দেখ্‌লিনে কিছু না, তোরাই বল্‌বি সে নয় ?”

নয়ন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “কি জানি দিদি, তোমরাই জান ভাই ! তোমরা আমার চুল বেঁধে গহনা কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখ্‌বে, আর বাবা যদি বলেন সে নয়—তখন ? সে সব গয়না কাপড় খুলে দিতে যে পথ পাবে না ! ছি ছি, কি ঘেন্না ! সে লজ্জায় পড়ার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। না না, আমি চুল বাঁধবো না, গয়না কাপড়ও পরবো না—যেমন আছি তেমনই আমায় থাকতে দাও দিদি, তোমার পায়ে পড়ি !”

রতনমণি এই সময় কি লইতে ঘরে আসিয়াছিল, শেষদিক্‌কার কথাগুলি শুনিয়া সেও আসিয়া ভগিনীদ্বয়ের নিকট বসিল। নয়নমণির কপালের কাছে দুই চারিগাছি এলোমেলো চুলকে ঠিক করিয়া দিয়া বলিল, “অমন অবুঝপনা করে কি, ছি ! আমি বল্‌ছি সে বিনোদ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বাবা এখন যাই বলুন, তাকে দেখলেই চিন্‌তে পারবেন। সে জন্যে ত আমি ভয় করছিনে—আমার ভয় কি তা শোন্। তার মনে একটা বৈরাগ্য হয়েছিল, তাই না সে ঘর সংসার ছেড়ে পালিয়ে এসেছে ! সে কি অমনি এককথায় আবার সংসার ধর্ম্মে ফিরে আসতে চাইবে ? আমরা অবশ্যি যতদুর সাধ্যি তাকে বোঝাব। কিন্তু আমাদের কথায় তার মন যদি না ফেরে, তখন ত তোমাকেই চেষ্টা করতে হবে।”

নয়নমণি বলিল, "আমার পোড়াকপাল আর কি! আমি আবার কি চেষ্টা করবো? আমি কথাটিও কইতে পারবো না—সে আমি কিন্তু বলে রাখছি?"

রতন বলিল, "তোকে কি তার কাছে হাত নেড়ে মুখ নেড়ে উকীলের মত বক্তিমে করতে বল্‌ছি!"

"তবে?"

"যদি দরকারই হয়, সে তখন যা করতে হবে আমি তোকে বলে দেবো। এখন লক্ষ্মীটি হয়ে, যা বলি তাই শোন্‌। মুখে হাতে সাবান দিয়ে চুলটুল ততক্ষণ বাঁধ—আমি আবার আসছি।"—বলিয়া রত্নমণি উঠিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঁচটা বাজিতে তখনও পাঁচ সাত মিনিট বাকীই ছিল, বদ্ধ সদর দরজার শিকল ঝম্‌ঝম্‌ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, "বাড়ীতে কে আছেন?"

গৌরমণি, বোনের চুলবাঁধা ছাড়িয়া পিতার ঘরে ছুটিয়া আসিয়াছিল; সে তাড়াতাড়ি বলিল, "বাবা, বিনোদেরই গলার স্বর না?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কি জানি! ঠিক—বুঝতে পারছি কৈ?"

দ্বিতীয়বার শব্দ আসিল—"বাড়ীতে কে আছেন?"

রতনও রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে বলিল,

"সাড়া দিন বাবা। নৈলে সে তিনটি বার ধর্ম্মডাক ডেকে, হয়ত চলেই যাবে।"

গলির উপর যে জানালা খুলিয়াছে, তাহার নিকটেই বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিলেন, হাঁকিলেন—"কাকে চান আপনি?" উত্তরে কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি কাণ খাড়া করিয়া রহিলেন।

নিম্ন হইতে শব্দ আসিল, "হরিকিঙ্কর বাবু কি এই বাড়ীতে থাকেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—আসছি"- বলিয়া তিনি নীচে নামিবার জন্য বাহির হইলেন। রতন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "বাবা, আপনি থাকুন, আমি গিয়ে দরজা খুলে দিচ্চি। কিন্তু বাবা (রতন হাত দুটি যোড় করিল) দোহাই আপনার, সে নিজের পরিচয় যতই অস্বীকার করুক, আপনি যেন তার উপর চটে উঠে কিছু তাকে বলবেন না। আপনি শুধু দেখুন, সে যথার্থ বিনোদ কি না। আপনার মন যদি নিঃসন্দেহ হয়, তখন, আর যা করবার আমরা করবো।"—বলিয়া রতন প্রায় ছুটিয়া, সিঁড়ি নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

রতনকে দেখিবামাত্র যুবক বলিল, "দেখুন, আমি সত্যরক্ষা করেছি।"

রতন বলিল, "এস ভাই এস। তুমি যে ফাঁকি দিয়ে পালাবে না, সে বিশ্বাস আমার ছিল। চল, উপরে চল।"

সদর দরজা বন্ধ করিয়া, আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ির কাছে আসিয়া রতন হঠাৎ দাঁড়াইল। বলিল, "দেখ ভাই, একটা কথা

বলে দিই। তোমার শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হলেই তাঁকে প্রণামটা কোরো। নৈলে তিনি চটে যান—বুড়োমানুষ কি না!"

যুবক বলিল, "আমার আবার শ্বশুর কে আছে? আমি ত আপনাকে বলেছি আমি অবিবাহিত!"

রতন বলিল, "হল! আবার বুলি ধরলে বুঝি? আচ্ছা শ্বশুর নাই হলেন, ব্রাহ্মণ ত—প্রাচীন হয়েছেন, পুণ্যের শরীর, জপ তপ নিয়ে আছেন, তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে একটা প্রণাম করলে কোনও দোষ আছে কি?"

"না, তা দোষ নেই—প্রণাম করবো এখন। কিন্তু একটা কথা। আমায় দয়া করে' একটু শীঘ্র ছেড়ে দিতে হবে। আমার অনেক কায আছে।"—বলিয়া রতনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুবক সিঁড়ি উঠিতে লাগিল।

বৃদ্ধ হরিকিঙ্কর শয়নকক্ষের দ্বারদেশে হুঁকা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া, সিঁড়ির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। আগন্তুক তাঁহার চক্ষুগোচর হইবামাত্র তিনি বারান্দায় বাহির হইয়া দাঁড়াইলেন। যুবক আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"এস বাবা—চিরজীবী হও"—বলিয়া বৃদ্ধ আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন।

শয়নকক্ষে, জানালার কাছে মাদুর বিছান ছিল। বৃদ্ধ, আগন্তুককে লইয়া গিয়া সেখানে বসাইলেন। বলিলেন, "তোমার শরীর ভাল আছে ত?"

যুবক, তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া, উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কাশীতে কতদিন আসা হয়েছে?"

যুবক পূর্ব্ববৎ উত্তর করিল, "বছর দুই হবে।"

"বিশ্বনাথ সেবাশ্রমে আছ শুন্‌লাম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তুমি সেখানে কি কর?"

"রোগীদের চিকিৎসা করি। সেবা শুশ্রূষা করি।"

"মাইনে দেয়?"

"আজ্ঞে না। সেখানে খাই দাই থাকি। হাত খরচ বলে' সামান্য কিছু দেয়। এই কাযেই জীবন উৎসর্গ করেছি।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সেবাশ্রম ব্যাপারটা কি?"

যুবক বলিল, "এই যে সেবাশ্রম, এটা বিশ্বনাথ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশের অনেক বড় বড় লোক—রাজা মহারাজা সব এই মিশনের পৃষ্ঠপোষক। কাশীতে এসে যারা পীড়িত হয়ে পড়ে, সহায় সম্পত্তি নেই, ওঁরা তাদের ঐ সেবাশ্রমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান্, সেবাশুশ্রূষা করান্। হাঁসপাতালের মত আর কি।"

বৃদ্ধ ব্যাকুলভাবে ছেলেটির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাশীতে আসবার আগে কোথায় ছিলে বাবা?"

"নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতাম।"

"তোমার বাপ মা বেঁচে আছেন?"

"আজ্ঞে না।"

"তুমি বাড়ী ছাড়ার আগেই তাঁরা গত হয়েছিলেন, নয় ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাড়ীতে এখন কে কে আছেন ?"

"তা জানিনে।"

বৃদ্ধ এক একবার আকুল নয়নে ছেলেটির পানে চাহেন, আবার ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কি চিন্তা করেন। দেওয়ালে ঠেসান হুঁকাটি লইয়া, কলিকায় হাত দিয়া দেখিলেন, আগুন নিবিয়া গিয়াছে। বলিলেন, "বাবা, তুমি একটু বস, তামাকটা সেজে আনি।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

পার্শ্বের ঘরে যাইবামাত্র রতনমণি গৌরমণি উভয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমাদের বিনোদ নয় ?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "অনেকটা ত সেই রকমই বোধ হচ্চে—কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কি বাবা ?"

"কিন্তু—ঠিক ত বুঝতে পারছিনে! নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে যে মা! গলার স্বরটা তারই মতন যেন বোধ হচ্চে; আর সেই রকম মাথা দুলিয়ে কথা কয়। কিন্তু, ও রকম ত অনেকেরই দেখেছি।"

"মুখ চোখ ?"

"মুখ চোখ ? হ্যাঁ, তাও কতকটা যেন তারই মত। কিন্তু—কিন্তু—আমার চোখের সে জ্যোতি যে আর নেই! তা ছাড়া,

আজ চার বছর তাকে দেখিনি। আমি ত নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে মা।"

গৌরমণি ম্লানমুখে চক্ষু নত করিল। রতনমণি বলিল, "সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গলার স্বর—তবু আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না—এ যে আপনার অন্যায় বাবা!"

বৃদ্ধ একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তা, কি করব মা? বাবা বিশ্বনাথই জানেন।"

গৌরমণি বলিল, "তা হলে—এখন কি করা যায়? ওকে কি ছেড়ে দেব?"

"ছেড়ে দেবে?—কিন্তু যদি—সেই হয়? হাতছাড়া করাটা! আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে! তোমরা যা ভাল বোঝ তা কর বাছা। একটু তামাক সেজে দাও খাই।"—বলিয়া সেইখানে তিনি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন।

পিতাকে তামাক সাজিয়া দিয়া, গৌরমণি আগন্তুকের জল-যোগের জন্য আসন বিছাইল, রতনমণি খাবার সাজাইয়া আনিতে গেল। বৃদ্ধ আসিয়া আগন্তুককে ডাকিয়া আনিলেন; সে আসিয়া কিঞ্চিৎ আপত্তির পর জলযোগে বসিল। গৌরমণি নিকটে রহিল।

তামাকু সেবনান্তর, বৃদ্ধ নিজ কক্ষে গিয়া জামা গায়ে দিয়া, কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া, লাঠিহস্তে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রতন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় চল্লেন বাবা?"

"আমি একবার বিশ্বনাথ দর্শন করে আসি।"

রতন বলিল, "ওকে একটু বোঝাবেন না ?"

"তোমরা বোঝাও—যা ভাল হয় কর।"

রতন বলিল, "আমরা ত বোঝাব ; কিন্তু সে শুনবে কি ? আপনি থাকলে—"

"না না, সে আমি পারব না। আমার মনটা ভারি অশান্ত হয়েছে। আমি এখন মন্দিরে গিয়ে বাবার পায়ের কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকব।"—বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

রতন তাঁহার পথ আগলাইয়া বলিল, "শুনুন বাবা। আমাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে এই বিনোদ। আমরা দুই বোনে বুঝিয়ে শুঝিয়ে যদি না পারি, তবে একটা মতৎলব ঠাউরেছি—আপনার হুকুম পেলে তা করতে পারি।"

"কি, বল।"

"নয়নকে ওর সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিই। আমাদের কথায় ওর যদি মন না গলে—নয়নের মুখখানি দেখেও গলতে পারে। দেখুক, কি মহা নিষ্ঠুরের কায সে করেছে।—আপনি কি বলেন ?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "নয়নের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে বলছ ? সেটা কি ঠিক হবে ? কি জানি। একটু ভাবি দাঁড়াও। দূর হক্‌গে—আমার মাথাই ঘুলিয়ে গেছে। দুর্ব্বল-মাথা—বুদ্ধিও দুর্ব্বল। হরি হে ! সে তোমরা যা হয় কর। বেশ করে বুঝে দেখ, যদি মনে তোমাদের কোনও সন্দেহ না থাকে, তবে দেখা করাও। আচ্ছা, নকে একবার এখানে ডাক।"

রতন গিয়া নয়নকে লইয়া আসিল। বৃদ্ধ ব্যাকুলনেত্রে মেয়ের অবনত মুখখানির প্রতি চাহিয়া, তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"বাবা বিশ্বনাথ তোমায় রক্ষা করুন। সীতা, সাবিত্রী তোমায় তাঁদের পায়ের ধূলো দিন।"—বলিয়া তিনি দ্রুতপদে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

রতন ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কখন ফিরবেন বাবা?"

"আরতির পর"—বলিয়া তিনি লাঠি ঠক্‌ঠক্ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন।

জলযোগ শেষ হইলে রতনমণি আগন্তুককে পিতার কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল। গৌরমণি ডিবায় ভরিয়া পাণ আনিয়া দিল। দুই ভগিনী মেঝের উপর বসিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিল।

রতন বলিল, "তা হলে, কি ঠিক করলে ভাই?"

যুবক বলিল, "কিসের কি ঠিক করলাম?"

"ছুঁড়িটিকে কি ভাসিয়ে দেবে? সেই কি ধর্ম্ম?"

যুবক বলিল, "এখনও কি আপনাদের ভ্রম গেল না? এখনও আপনারা মনে করছেন আমি আপনাদের ভগিনীপতি? আপনার বাবা আমায় দেখে কি বল্লেন?"

রতন বলিল, "তিনিও তোমায় চিনেছেন—তুমি বিনোদ।"

যুবক বলিল, "না, আমি আপনাদের বিনোদ নই। কেন মিছে আমায় ধরপাকড় করছেন?"

দুই বোনে তখন যুবককে অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিল।

বলিল—"ভাই, অনেক দিন তোমায় দেখিনি বটে, কিন্তু আপনার জনকে কি মানুষ ভোলে? সেই মুখ, সেই চোখ, সব সেই। সেও কলকাতা ক্যাম্বেল ইস্কুলে ডাক্তারী পাশ করেছিল, তুমিও এখানে ডাক্তারীই করছ। তারও বাপ মা ছিল না, তোমারও নেই। কেন মিছে আমাদের ভোলাচ্চ ভাই?" —কিন্তু তথাপি কিছুতেই যুবক স্বীকার করে না যে সে বিনোদ।

এইরূপ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। যুবক বলিল, "এখন তবে আমায় বিদায় দিন।"

রতন বলিল, "একটু বোস। বাবা ফিরে আসুন।"—বলিয়া সে উঠিয়া, বাতিটা জ্বালিয়া দিয়া, বাহিরে গেল। কিছুক্ষণ পরে ডাকিল—"গৌরী, শোন্।"

গৌরমণিও চলিয়া গেল—যুবক একা রহিল। একবার সে ভাবিল, এই সুযোগে পলায়ন করি। উঠি উঠি করিতেছে, এমন সময় দ্বারের নিকট মলের ঝুম ঝুম শব্দ শুনিয়া চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী, তৎপশ্চাৎ গৌরমণি দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল।

গৌরমণি বলিল, "ভাই, এত করে আমরা সকলে মিলে তোমাকে বোঝালাম, কিছুতেই তুমি শুনলে না। দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী করে, যার চিরজীবনের সুখদুঃখের ভার তুমি নিয়েছ, তুমি তাকে পরিত্যাগ করলে তার উপায় কি হবে, সেইটে তাকে বুঝিয়ে দিয়ে, যদি যেতে ইচ্ছা হয় যাও!"—বলিয়া গৌরমণি

বোনটিকে ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া, কবাট টানিয়া ঝম্ করিয়া শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

যুবক মাদুরের উপর বসিয়া ছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া উঠিল। নয়নমণি ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া, গলবস্ত্র হইয়া, তাহাকে প্রণাম করিয়া অবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবক নির্নিমেষ নয়নে, এই যুবতীর সুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "তুমি আমায় চিন্‌তে পারছ?"

নয়নমণি নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল—"হাঁ।"

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কে?"

নয়ন অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল, "আমার স্বামী।"

"বেশ চিনেছ?"

নয়নমণি আবার নীরবে মাথা হেলাইল।

যুবক মৃদুস্বরে বলিল, "কিন্তু আমি ত তোমার স্বামী নই।"

নয়ন এবার মুখখানি তুলিল। বলিল, "তুমি আমার স্বামী নও একথা তুমি বোলো না। আমাকে যদি তুমি পায়ে না রাখ ফেলে দিতেই চাও, বরং বল 'তুমি আমার স্ত্রী নও।'—তুমি আমার ইহকালের—আমার পরকালের সম্বল।"—কথাগুলি শেষ হইবামাত্র তাহার চক্ষু দুইটি হইতে ঝরঝর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। তাহার দেহখানি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

যুবক বলিল, "বস বস! নইলে পড়ে যাবে। বস—এ কি বিপদে পড়লাম!"—বলিয়া নিজে সে মাদুরের উপরে বসিল।

নয়ন মেঝের উপর বসিয়া, বামহস্তের উপর মাথাটি ঝুঁকাইয়া দিয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

যুবক বলিল, "কেঁদনা কেঁদনা, চুপ কর। তোমার সমুখে কি বিপদ তা তুমি বুঝতে পারছ না? ধর আমি যদি বলি, আচ্ছা হ্যাঁ আমিই তোমার স্বামী, তোমায় নিয়ে ঘরকন্না করি—তার পর যদি প্রমাণ হয়ে যায় আমি তোমার স্বামী নয়, আমি ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত নয়—আমি কায়েত, আমার নাম সুধীরচন্দ্র বসু—তখন কি সর্ব্বনাশটা হবে বল দেখি। এটা তুমি ভাবছ না?"

নয়ন তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি তুলিয়া বলিল, "তুমি আমার স্বামী।"

যুবক মুখ নীচু করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "আমি এখন চল্লাম। এ সব ভয়ানক অন্যায় কথা। একজন পুরুষের সঙ্গে এ রকম ভাবে"—বলিয়া সে উঠিয়া জুতা পায়ে দিল।

নয়ন বলিল, "কি করে যাবে? বাইরে যে শিকল বন্ধ।"

"তাও ত বটে।"—বলিয়া যুবক থামিল।

নয়ন বলিল, "বস। যদি যেতেই হয়, যেও, আমরা ত তোমায় ধরে রাঁখতে পারব না। একটা কথা আমায় বলে যাও। তুমি যে বিয়ে করে আমায় পরিত্যাগ করে চল্লে, আমার উপায় কি হবে?"

যুবক বসিল না। বলিল, "সে আমি কি জানি?"—বলিয়া সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। কবাটে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "দুয়ারটা খুলে দিন।"

কেহ দুয়ার খুলিবার কোনও লক্ষণ দেখাইল না। ক্রমে যুবক অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল। দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত পদাঘাত করিয়া সে চীৎকার জুড়িয়া দিল। তখন রতনমণি আসিয়া শিকল খুলিল।

যুবক বলিল, "এরকম সব, ভারি অন্যায় আপনাদের! আমি চল্লাম।"

রতনমণি বলিল, "সেইটেই কি তোমার ধর্ম্ম হল?"

"আমার ধর্ম্ম আমি জানি।"—বলিয়া যুবক হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি নয়টার সময় হরিকিঙ্কর বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। গৌর-মণি তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল?"

গৌরমণি সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে, পিতাকে সকল কথা বলিতে লাগিল।

বৃদ্ধ নিজ শয়নকক্ষে আসিয়া, জামা জুতা ছাড়িয়া, হস্তপদাদি ধৌত করিতে করিতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন, "এখন বোধ হচ্চে, আমার মনে যা সন্দেহ ছিল, সেইটিই ঠিক—সে আমাদের বিনোদ নয়। তোমরা এত করে বল্লে, নয়ন পর্য্যন্ত অত কাঁদাকাটি করলে, সে যদি বিনোদ হত, তা হলে অন্ততঃ নিজের পরিচয়টা স্বীকার করে' বল্‌ত, আমি আর সংসারী হব না, কেন তোমরা আমায় এত আকিঞ্চন করছ! যা হোক, নয়নকে সে ছোঁয়নি ত?"

গৌর বলিল, "নয়নের কাছে শুনলাম, সে মাদুরে বসে' ছিল, নয়ন নীচে ছিল। প্রণাম করেছিল, তাও পায়ে হাত দেয় নি!"

"ভাগ্যিস্ ছোঁয়নি। কাল তোমরা যখন গঙ্গাস্নান করতে যাবে, নয়নকেও নিয়ে যেও—ও-ও যেন একটা ডুব দিয়ে আসে। ছি ছি কি লজ্জার কথা! বাবা বিশ্বনাথ ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন।"—বলিয়া বৃদ্ধ উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি, একদিন বেলা নয়টার সময়, বৃদ্ধ হরিকিঙ্কর সেই মাত্র সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া কন্যা-প্রদত্ত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধপানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, নয়ন সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, এমন সময় নিম্নে উঠান হইতে শব্দ শুনিতে পাইল, "এ দাই, বাবু হ্যায়?" দাই বলিল, "বাবু উপরমে—যাও না!"

নয়ন বারান্দার প্রান্তে রেলিঙের নিকট গিয়া নীচে চাহিল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল—একমাস পূর্ব্বে, স্বামী বলিয়া সাশ্রুনয়নে যাহার পদপ্রান্তে সে বৃথা লুটাইয়াছিল—সেই আবার আসিয়াছে।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইবামাত্র নয়ন তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়া আশ্রয় লইল।

যুবক আসিয়া পৌঁছিবামাত্র হরিকিঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কে ?"

যুবক জুতা খুলিতে খুলিতে বলিল, "আজ্ঞে আমি।"—বলিয়া ঢিপ্ করিয়া তাঁহাকে একটা প্রণাম করিল।

"কে ?" জিজ্ঞাসা করিলেও পূর্ব্বেই বৃদ্ধ তাহাকে চিনিয়াছিলেন এবং তাহাকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। কোনও আশীর্ব্বাদ না করিয়া, কঠোরস্বরে বলিলেন, "তা, এ মেয়েছেলের বাড়ী, কোনও খবর না দিয়ে হঠাৎ তুমি ঢুকে পড়লে কোন্ আক্কেলে ?"

তাঁহার মুখভঙ্গি দেখিয়া যুবক একটু শঙ্কিত হইল। বলিল, "নীচে দাই বাসন মাজছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বল্লে আপনি বারান্দায় বসে আছেন—যা হোক্ আমার দোষ হয়ে গেছে, মাফ্ করবেন।"

এ কথায় বৃদ্ধের মন যেন একটু নরম হইল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, বস। এখন কি মনে করে এসেছ ?"

"আজ আপনার কাছে, সে দিনের অপরাধের আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি—আমায় আপনি মাফ্ করুন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কেন ? ক্ষমা কিসের ?"

যুবক বলিল, "নিজের পরিচয় গোপন করার অপরাধ। আপনারা সেদিন এত করে আমায় বল্লেন, আমি তখন কিছুতেই স্বীকার করলাম না যে আমি আপনার জামাই বিনোদ। আমার ভারি অপরাধ হয়ে গেছে, আমায় মাফ করুন।"—বলিয়া সে মুখখানি নীচু করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ ওষ্ঠযুগল গুটাইয়া, ব্যঙ্গভরে বলিলেন, "সেদিন অত সাধাসাধি, কিছুতেই স্বীকার করলে না যে তুমি বিনোদ, বল্লে আমি সুধীর বোস, আমি কায়েত—আর একমাস যেতে না যেতেই তুমি বিনোদ চাটুয্যে হয়ে গেলে? হঠাৎ এ মতটা বদলাবার কারণটা শুনতে পাই কি?"

যুবক বলিল, "ভেবে চিন্তে দেখ্‌লাম, বিবাহিতা স্ত্রীকে এ রকমভাবে ভাসিয়ে দিলে সেটা ঘোর অধর্ম্ম হয়।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তাই কি? না, মতটা বদলাবার অন্য কিছু একটা কারণ ঘটেছে?"

"আজ্ঞে, আর কি কারণ ঘট্‌তে পারে? আমিই বিনোদ—এ ছাড়া আর কোনও কারণ নেই।"

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্ত যুবকের পানে তাচ্ছিল্যভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি যে বিনোদ, তার প্রমাণ?"

যুবক মুখ তুলিল। বলিল, "একমাস আগে আপনারা সকলেই আমাকে নিঃসন্দেহে বিনোদ বলেই চিনেছিলেন, এর বেশী আর কি প্রমাণ হতে পারে?"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমি তখন তাই মনে করেছিলাম বটে, স্বীকার করি; তবে গোড়া থেকেই মনে একটু সন্দেহ যে না ছিল তা নয়। বাপু হে, তুমি যদি সত্যি আমার জামাই বিনোদ হতে, তবে সেই দিনই স্বীকার করতে। অত করে আমরা সবাই তোমায় সাধাসাধি কর্‌লাম, মেয়েটা পর্য্যন্ত তোমার কাছে গিয়ে কেঁদে মাটী ভিজিয়ে দিলে, তুমি সত্যি

বিনোদ হলে সে রকম করে কখনই তাকে ফেলে যেতে পারতে না! বামুন কায়েথে ত পারেই না, চণ্ডালেও পারে কি না সন্দেহ।"

যুবক কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। শেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কাযটা আমি চণ্ডালের মতই করেছি বটে, স্বীকার করি। যা হয়ে গেছে, তার ত আর চারা নেই। এখন, কি হলে আপনার মনের সন্দেহ যায় তাই বলুন। আমায় সব কথা জিজ্ঞাসা করুন—আমাদের গ্রামের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা—আপনার যা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করুন।"

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্ত লোকটির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া, ব্যঙ্গভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেনারস ব্যাঙ্কে তোমার কি কোনও আলাপী বন্ধুবান্ধব চাকরি করে?"

"না। কেন?"

"তাই বলছি। ব্যাঙ্কে আমার যে হাজার কয়েক টাকা আছে, সে খবরটি কি করে পেলে তুমি, বল দেখি বাপু?"

যুবক বলিল, "আজ্ঞে, সে সব কোন খবরই ত আমি জানিনে। আর, সে খবরে আমার দরকারই বা কি?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "দরকারই যদি নেই, তবে তুমি কি লোভে আজ আমার জামাই সেজে এসেছ শুনি? তোমার চালাকি আমি কি কিছু বুঝতে পারছিনে ভেবেছ? এই সময়ের মধ্যে দেশে গিয়ে, সব সুলুক সন্ধান খবর বার্ত্তাগুলি জেনে এসেছ, যাতে আমরা তোমায় কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে ঠকে না যাও। জোচ্চোর কাঁহেকা!"

একথা শুনিয়া যুবক একটু গরম হইয়া একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ওকি কথা বলছেন আপনি ! আমি জোচ্চোর ?"

বৃদ্ধ রাগিয়া বলিলেন, "তুই জোচ্চোর, তোর বাপ জোচ্চোর, তোর চৌদ্দপুরুষ জোচ্চোর ! নিকালো হিঁয়াসে।"—বলিয়া তিনি কম্পিতহস্তে সিঁড়ির দরজার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিলেন।

যুবক উঠিল। জুতা পরিতে পরিতে বলিল, "অন্যায় সন্দেহ করে আমায় তাড়ালেন। শেষে পছ্‌তাতে হবে এর জন্যে।"

"হয় হবে। তুমি সরে পড়।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে যুবক সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। বাটীর বাহির হইয়া, গলির মধ্যে অল্পদূর অগ্রসর হইতেই দেখিল, রতনমণি গৌরমণি দুইজনে গঙ্গাস্নান করিয়া, গামছায় তরীতরকারী বাঁধিয়া ফিরিতেছে। যুবক নিকটস্থ হইয়া বলিল, "দিদি, আমার অপরাধ তোমরা ক্ষমা কোরো। সেদিন তোমাদের সঙ্গে আমি বড়ই কুব্যবহার করেছি। আমিই তোমাদের বিনোদ।"

যুবকের কথার স্বর ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া উভয় ভগিনী আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। রতন বলিল, "যাচ্চ কোথা, বাড়ী চল।"

যুবক বলিল, "বাড়ীতেই গিয়েছিলাম। বাবা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, তিনি আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

রতন বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ? বল কি? কি বল্লেন তিনি?"

যুবক কাঁদকাঁদ স্বরে বলিল, "বল্লেন তুই জোচ্চোর, আমার টাকার লোভে জামাই সেজে এসেছিস্। আমার বাপ চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত তুলে গাল দিয়েছেন।"

রতন ও গৌর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। রতন হঠাৎ যুবকের হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "ভাই, তুমি বাবার উপর রাগ কোরনা—তিনি বুড়োমানুষ, চোখে ভাল দেখতে পান না, তাই তিনি তোমায় চিনতে না পেরে ঐ সব কথা বলেছেন। লক্ষ্মী ভাইটি আমার, রাগ কোর না। তুমি এখন সেবাশ্রমে যাচ্চ ত? সেখান তুমি থেক, আমি ওবেলা গিয়ে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।"

যুবক বলিল, "না দিদি ছেড়ে দিন, আর আমি আস্‌বো না দিদি। ঢের হয়েছে। বাবা বিশ্বনাথের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে' দিয়েও, সংসার-সুখের লোভে সে সংকল্প ছেড়ে চলে আসছিলাম, বাবা বিশ্বনাথ তাই আমার জন্য এই চাবুকের ব্যবস্থা করেছেন, চাবুক খেয়ে, আবার তাঁরই পায়ে ফিরে যাচ্চি।"—বলিয়া যুবক ঝুঁকিয়া, রতনও গৌরমণির পদস্পর্শ করিয়া, হন্ হন্ করিয়া চলিল।

রতন ও গৌরমণি তখন তাতাতাড়ি বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, পিতা হাতের উপর মাথাটি নীচু করিয়া নীরবে বসিয়া আছেন। গৌরমণি রান্নাঘরে গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও দিদি, শীগ্‌গির আয়, সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

"কি কি" বলিয়া রতন সেইদিকে ছুটিল। বৃদ্ধও উঠিয়া ধীরে

ধীরে রান্নাঘরে গিয়া দেখিলেন, নয়নমণি ঘরের মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

রতন বলিল, "বাবা, রাগের মাথায়, জামাইকেও তাড়ালে, মেয়েটারও প্রাণবধ করলে?"—বলিয়া তাড়াতাড়ি সেইখানে সে বসিয়া পড়িয়া, নয়নমণির মাথা কোলে তুলিয়া লইল। গৌরমণি জল আনিয়া মূর্চ্ছিতার মুখে চোখে ঝাপ্টা দিতে লাগিল। বৃদ্ধ হতাশ ভাবে সেখানে বসিয়া, মুখে শুধু হায় হায় করিতে লাগিলেন।

প্রায় পনেরো মিনিট শুশ্রূষার পর নয়নমণির মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল।

রতনমণি ও গৌরমণি সারাদিন পিতাকে অনেক বুঝাইল। তাহারা বলিল, "সে যখন বল্লে যে আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমায় পরীক্ষা করুন, দেখুন আমি সত্যি আপনার জামাই কি না, তখন তাকে গালমন্দ দিয়ে তাড়ানো ঠিক হয়নি। আপনি বল্‌ছেন যে সে টাকার লোভে, এই একমাস দেশে গিয়ে সমস্ত খবর সন্ধান জেনে তৈরি হয়ে এসেছে। বেশ ত, এমন ঢের কথা তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারা যেত, যা আসল বিনোদ ছাড়া আর কেউ জানে না। অন্য কথায় কায কি, নয়নের সঙ্গেই সাত রাত্তির সে একত্র ছিল ত? নয়নই তাকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারত, যার উত্তর আসল বিনোদ ছাড়া কেউ বলতে পারে না।"

অবশেষে বৃদ্ধ সম্মত হইলেন। বলিলেন; আচ্ছা বেশ, তাহাকে আবার ডাকিয়া আনা হউক, রীতিমত পরীক্ষান্তে যদি মনের সন্দেহ দূর হয়, তবে তাহাকে জামাই বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এই কথা শুনিয়া, বিকালে ৪টার সময় মহোল্লাসে রতনমণি বিশ্বনাথ সেবাশ্রমে গিয়া সন্ধান লইয়া জানিল, তথায় সে যুবক সকলের নিকট বিনোদ চট্টোপাধ্যায় নামেই পরিচিত ছিল, অদ্য বেলা দুইটার সময় জিনিষপত্র লইয়া, গাড়ী ডাকিয়া সে ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছে, কোথায় যাইবে কাহাকেও বলিয়া যায় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কন্যার মুখে এই সকল সংবাদ শুনিয়া, বৃদ্ধ শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হায় হায়! রাগের বশে এ কি কায করে বসলাম!" অনুশোচনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। রতনমণি তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল, "আপনি আর কি করবেন বাবা? যার অদৃষ্টে যা আছে, তাই ত হবে; সে ত কেউ রদ করতে পরবে না —ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও না।"

একদিন কাটিল, দুইদিন কাটিল। এ দুইদিন নিয়মিত সময়ে হরিকিঙ্কর আহারে বসিয়াছেন বটে, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য অধিকাংশই অভুক্ত পড়িয়া থাকিয়াছে। রাত্রে নিদ্রা হয় না, উঠিয়া বিছানায় বসিয়া থাকেন, আর হায় হায় করেন। তৃতীয় দিনে; বিশ্বনাথ সেবাশ্রমে গিয়া তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনোদের কোনও সংবাদ তাহারা পাইয়াছে কি না। তাহারা বলিল কোনও সংবাদই তাহারা পায় নাই। নয়নমণির বিশীর্ণ

পাণ্ডুর দেহখানি ও ম্লান মুখচ্ছবি দেখিয়া তাঁহার বুকের ভিতরটা হাহাকার করিতে থাকে।

চতুর্থ দিনে তিনি রতন ও গৌরমণিকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার বোধ হয়, মনের খেদে কাশী ছেড়ে আর কোনও তীর্থ-স্থানে গিয়ে সে আশ্রয় নিয়েছে। এখানকার বাড়ী বন্ধ করে, চল আমরা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই—যদি কোথাও আবার তার দেখা পাই।"

দুই তিন দিন ধরিয়া পিতা ও কন্যাদ্বয়ের মধ্যে এই বিষয়ে বাদানুবাদ চলিল। রতন বলে, "আপনার এই দুর্ব্বল শরীর, এ অবস্থায় দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান কি আপনার শরীরে সইবে? বিদেশ বিভুঁইয়ে যদি কোনও অসুখ বিসুখ হয়ে পড়ে, তা হলে আমরা মেয়েমানুষ, আপনাকে নিয়ে অতন্তরে পড়ে যাব যে! সে কাশী ছেড়ে গিয়েছে, আবার হয়ত ফিরে আসবে। মাঝে মাঝে সেবাশ্রমে গিয়ে খবর নিলেই হবে—দিন কতক দেখাই যাক না।"

এইরূপে একমাস কাটিল। দ্বিতীয় মাসের মাঝামাঝি একদিন বৃদ্ধ পূজা আহ্নিক সারিয়া, দুগ্ধপান করিয়া নয়নমণিকে বলিলেন, "আমি একবার অগস্ত্যকুণ্ডে যাচ্ছি, ঘণ্টাখানেক পরে ফিরবো।" দাই নিম্নে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, বৃদ্ধ তাহাকে বলিয়া গেলেন, "আমি বেরুচ্চি, ছোটদিদিমণি একলা রইল, বড় দিদি মেঝদিদি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুই বাড়ীতে থাকিস্, কোথাও যেন যাস্‌নি।"—বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

নয়নমণি রান্নাঘর বন্ধ করিয়া, পিতার ঘরে আসিয়া তাঁহার মহাভারত খানি লইয়া, মেঝের উপর বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পড়িবার পর, দাই নিম্ন হইতে আসিয়া বলিল, "ছোটদিদিমণি, ডাকওয়ালা এই রেজেষ্টারী চিঠি নিয়ে এসেছে; রসিদ লিখে দাও।"

নয়ন চিঠিখানা হাতে করিয়া দেখিল, তাহার নামেরই চিঠি। উপরে বাঙ্গালায় স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে শ্রীমতী নয়নমণি দেবী। তাহার পর, নীচে ইংরাজিতে কি সব আছে তাহা নয়ন পড়িতে পারিল না।

এ চিঠি কে লিখিল? নয়নকে কেহ ত কোনও দিন চিঠি লেখে না! যাহা হউক, কম্পিত হস্তে রসিদে সহি করিয়া, চিঠিখানি খুলিয়া দেখিল, একখানি দশ টাকার নোট তাহার মধ্যে রহিয়াছে। তখন চিঠিখানি সে পড়িতে লাগিল—

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ

শরণং

আমিনাবাদ,

লক্ষ্ণৌ।

২২শে অগ্রহায়ণ।

নয়নমণি,

তুমি আমার এ পত্র পাইয়া বোধ হয় আশ্চর্য্য হইবে, কারণ

বিবাহের পর পাঁচ বৎসর মধ্যে কখনও তোমাকে আমি কোনও পত্র লিখি নাই, এই প্রথম।

যেদিন প্রথম রাস্তায় তোমার দিদিদের সহিত দেখা হয়, সে দিন বিকালে তোমাদের বাড়ী যাইবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কারণ সত্যবদ্ধ হইয়াছিলাম এবং দ্বিতীয়তঃ, আমি না যাইলে বড়-দিদি সেবাশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইবেন বলিয়া শাসাইয়া রাখিয়া-ছিলেন, সেবাশ্রমে সকলেই আমার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত ছিল, সুতরাং ধরা পড়িতাম। সেদিন বিকালে আমি তোমাদের কাশীর নদীয়া ছত্তরের বাড়ীতে গিয়া, মহাপাষণ্ডের মত তোমাদের সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, কিছুতেই স্বীকার করি নাই যে আমি সেই বিনোদ। তুমি যখন আমার কাছে বসিয়া কাঁদিয়াছিলে, তখন এক একবার আমার ইচ্ছা হইতেছিল যে স্বীকার করি; কিন্তু আমি বাবা বিশ্বনাথের সেবার জন্য নিজ জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলাম, গৃহী হইলে আমার ব্রতভঙ্গ হইবে এই ভাবিয়া তখন অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসি।

চলিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু যে ব্রতের জন্য তোমাদের সহিত এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া আসিলাম, সে ব্রতে আমি আর মন দিতে পারিলাম না। সারাদিন কেবল তোমার সেই অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুইটি স্মরণ হয়,—যে কাযে নিজেকে নিয়োগ করিয়াছিলাম, সে কাযে আর মন লাগে না। তোমার সেই মুখখানি, সেই কথাগুলি

কেবলই মনে পড়ে—আর বুকের মধ্যে কেমন হুহু করিতে থাকে। কাযের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তোমায় ভুলিতে চেষ্টা করি, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কেবলই মনে হয়, দীন দুঃখী ও আর্ত্তের সেবাশুশ্রূষার জন্য আমি নিজেকেঁ উৎসর্গ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া যাহাকে চিরজীবন রক্ষ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার উপায় কি করিলাম? নিজ ধর্ম্মপত্নীকে চিরদুঃখে ডুবাইয়া আমি এ কি ধর্ম্ম পালন করিতে বসিয়াছি!

এক মাস কাল নিজের মনে অনেক বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমি যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা ধর্ম্ম নয়, ঘোর অধর্ম্ম। তাই সেদিন ৯টার সময়, নিজ প্রকৃত পরিচয় দিয়', তোমাদের কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করিয়া, আবার গৃহবাসী হইবার অভিপ্রায়ে তোমাদের বাড়ী গিয়াছিলাম। বাবার সঙ্গে আমি যখন বসিয়া কথা কহিতেছিলম, তখন রান্নাঘর হইতে তোমার চক্ষু দুইটি একবার মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। বাবা আমার সহিত কিরূপ ব্যাবহার করিয়াছিলেন তাহা তুমি স্বকর্ণে সমস্তই শুনিয়াছ। তাহার পর, মনের ধিক্কারে সেখান হইতে আমি চলিয়া আসি। পথে দিদির সহিত দেখা হয়, তাঁহদের কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করিয়া আসিয়াছি। কেবল তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সুযোগ আমি পাই নাই—এই পত্রে তাহা করিতেছি। তুমি সেদিন আমায় বলিয়াছিলে, "আমি তোমার স্ত্রী হই না হই, তুমি আমার স্বামী।" তোমার স্বামীর পূর্ব্ব-আচরণের সমস্ত অপরাধ তুমি ক্ষমা কর, তোমার নিকটে এই আমার প্রার্থনা।

আমি এখানে বলরামপুর হাঁসপাতালে ডাক্তারী চাকরি গ্রহণ করিয়াছি। তোমার বাবা আমায় তাড়াইয়া দিলেও, আমি তোমার স্বামীই রহিলাম। যদি কখনও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা কর, আমার কাছে আসিতে চাঁও, তবে লিখিও, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। আমার প্রথম উপার্জ্জন হইতে দশটি টাকা এই পত্রের মধ্যে তোমায় পাঠাইয়া দিলাম, তুমি গ্রহণ করিলে সুখী হইব এবং আমার উপার্জ্জন সার্থক হইবে। কিন্তু কি জানি, বাবা যদি এ টাকা তোমায় লইতে না দেন, তবে বিশ্বনাথ সেবাশ্রমে ইহা পাঠাইয়া দিও।

তুমি যে আমায় পত্র লিখিবে, এ আশা করা আমার পক্ষে দুরাশা মাত্র। আমি মাঝে মাঝে তোমায় চিঠি লিখিব। বাবার যদি অমত না হয়, তাহা হইলে দিদিরা যেন দয়া করিয়া মাঝে মাঝে আমায় তোমার সংবাদটা দেন। তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইও।

তোমার হতভাগ্য স্বামী
বিনোদ।

নয়নমণির তখনও পত্র পড়া শেষ হয় নাই, রতনমণি ও গৌরমণি গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল। নয়ন পত্রখানি তাহাদিগকে দেখাইল। গৌরমণি বলিল, "বাবা এলে তাঁকে এ চিঠি দেখিয়ে, কালই আমরা সকলে লক্ষ্ণৌ যাই চল।"

অল্পক্ষণ পরে, বৃদ্ধ হরিকিঙ্কর হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ী

আসিয়া বলিলেন, "ওরে রত্নী, আমার আলমারিটা খোল্ দেখি চট্ করে ?"

"কেন বাবা, কি হয়েছে ?"—বলিয়া রতন চাবি বাহির করিল।

বৃদ্ধ অধীর হইয়া বলিলেন, "ওরে খোল্ খোল্—কথা পরে হবে এখন।"

রতনমণি আলমারি খুলিবামাত্র, বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি তাহার একটা স্থান হইতে এক বাণ্ডিল পুরাতন কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন। তাহার মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে, বিনোদের লেখা পাঁচ বৎসরের পুরাতন একখানি পত্র পাওয়া গেল। সেই পত্রখানি খুলিয়া, বৃদ্ধ নিজ পকেট হইতে একখানি তাজা পত্র বাহির করিয়া মিলাইতে লাগিলেন। কন্যাদ্বয়কে বলিলেন, "দেখ্ দেখি—দেখ্ দেখি—দুই চিঠিই একহাতের লেখা নয় ?"

রতনমণি গৌরমণি নূতন পত্রখানি তুলিয়া দেখিল, তাহাও বিনোদ লক্ষ্ণৌ হইতে সেবাশ্রমে লিখিয়াছে, বেতন পাইয়া আশ্রমের সাহায্যকল্পে পত্রমধ্যে দশটি টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে।

বৃদ্ধ বলিলেন, "আজ ওদের ওখানে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম, একটু আগেই তারা এই চিঠি পেয়েছে। চিঠি দেখেই হঠাৎ মনে হল, আমার কাছেও তার দুই একখানি চিঠি ত আছে, হাতের লেখা মিলিয়ে দেখি না! তাই চিঠিখানি তাদের কাছে চেয়ে নিয়ে, ছুটতে ছুটতে এসেছি। আমার ত ভাল নজর হয় না, তবু মনে হচ্ছে, দুই লেখা এক। তোরা বেশ করে দেখ্ দেখি—তোদের কি মনে হয় বল্ দেখি ?"

রতন হাসিয়া বলিল, "একই লেখা বাবা। এই দেখুন, বিনোদের আর একখানি চিঠি একটু আগেই এসেছে, নয়নকেও বিনোদ প্রথম মাইনে পেয়ে দশটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে।"—বলিয়া পত্রখানি সে পিতার হাতে দিল।

বৃদ্ধ পত্রখানি হাতে লইলেন, কিন্তু পড়িলেন না; ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "জয় বাবা বিশ্বনাথ! এমনি কৃপা যেন চিরদিন থাকে বাবা!" তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

পরদিন সকলে মিলিয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন।

বাজীকর

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ভগবান, আর কষ্ট দিও না।"

লোকটির বয়স ৬০ বৎসরের নিতান্ত কম হইবে না। গালের মাংসগুলি ঝুলিয়া গিয়াছে, চুল ও গোঁফ বিলকুল পাকা, লাঠি ধরিয়া একটু কোঁজা হইয়া পথ চলেন। দেহের বর্ণটি এক কালে খুব সুন্দর ছিল, এখন মলিন হইয়াছে, স্থানে স্থানে মেছেতা পড়িয়াছে, তথাপি এখনও রাগিলে গাল ও কপাল হইতে লাল আভা ফুটিয়া বাহির হয়। চোখ দুটি বড় বড়, তবে শাদা অংশগুলি ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে। এককালে ইনি সুপুরুষ বলিয়া গণ্য ছিলেন সন্দেহ নাই।

ইঁহার নাম শ্রীরামরতন বসু—অথবা প্রোফেসর বোস্। বাড়ী বরিশাল জেলায়। আজ ৭।৮ দিন হইল রঙ্গপুরে আসিয়াছেন; স্থানীয় টাউন হল ভাড়া লইয়া প্রতি সন্ধ্যায় ম্যাজিক দেখাইতেছেন। বাজারের নিকট টিনের ছাপ্পরওয়ালা দুইখানি দর্ম্মাঘেরা ঘর ভাড়া লইয়াছেন। এক খানিতে রান্না হয়; অপর খানির এক দিকে এক তক্তপোষে তিনি ও তাঁহার সহকারী যুবক, সম্পর্কে ভাগিনেয়, কুলদাচরণ শয়ন করেন। অন্য দিকে আর একখানি

তক্তপোষের উপর তাঁহার ম্যাজিকের আসবাব পত্র স্তূপীকৃত—তাহারই প্রান্তভাগে এক হাত চওড়া খালি স্থানটিতে ভৃত্য হরিদাস গুটি শুটি হইয়া কোন মতে রাত্রি যাপন করে। তক্তপোষ দুইখানি জরাজীর্ণ ও ছারপোকা-বহুল, তথাপি তাহার জন্য স্বতন্ত্র ভাড়া দিতে হয়।

অপরাহ্ণ কাল। ফাল্গুন মাস, কিন্তু এখনও রঙ্গপুরে বেশ শীত আছে। দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া, বালাপোষ গায়ে দিয়া তক্তপোষে বসিয়া বসুজ মহাশয় ধূমপান করিতেছেন—আর, ভাবিতেছেন। বারান্দায় হরিদাস বসিয়া সশব্দে মশলা বাঁটিতেছে; বামুন ঠাকুর তরকারী কুটিতেছে।

কুলদা গিয়াছে বিজ্ঞাপন বিলি করিতে। একখানা তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিয়া, বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সহরময় সে "অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য" ম্যাজিক খেলার বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া বেড়ায়, গাড়ীর ছাদে ইংরাজি বাজনা বাজিতে থাকে।

রামরতন বসু তামাক খাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন—ভাবিয়া কোনও কূল কিনারা পাইতেছেন না। গৃহে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং দুইটি কুমারী কন্যা। উভয় কন্যার বিবাহকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। বড়টির ত বৈশাখ নাগাদ না দিলেই নয়। অন্ততঃ পক্ষে একটি হাজার টাকার প্রয়োজন, কিন্তু আর্থিক অবস্থা শোচনীয়।

রামরতন যৌবন কালে বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়া, প্রসিদ্ধ

বাজীকর ভুরে খাঁ ও চাঁদ খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাকরেদী করিয়া ম্যাজিক শিখিয়াছিলেন। তাহার পর গৃহে ফিরিয়া বিবাহ করেন। কিছু পৈত্রিক জোৎজমি ছিল, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রথম পক্ষের স্ত্রী, স্বামীকে একে একে তিনটি কন্যা উপহার দিলেন। সে তিনটির বিবাহ দিতে দিতে জোৎজমিগুলি সমস্তই গেল। উপরন্তু কিছু ঋণও হইল। ঋণদায়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, রামরতন কলিকাতা হইতে ম্যাজিকের সরঞ্জাম কতক কতক ক্রয় করিয়া আনিলেন। তখন হইতে মাঝে মাঝে ম্যাজিক দেখাইতে বাহির হন। এই উপায়ে ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

তখন তখন তিন চারি মাস ম্যাজিক দেখাইয়াই সম্বৎসরের খোরাক সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু ইদানী ৫।৭ বৎসর হইতে এ ব্যবসায়ে কিছু মন্দা পড়িয়াছে। লোকে আর ম্যাজিক দেখিতে বড় চাহে না—তাহারা চাহে থিয়েটর কিংবা সার্কাস। সুতরাং এখন বৎসরে ছয় মাসেরও অধিক ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; কিন্তু বয়স ত দিন দিন কমিতেছে না - বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর সে শক্তি-সামর্থ্য নাই—এ দেশ ও দেশ ছুটাছুটি করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু না করিয়া উপায়ও ত নাই!

রঙ্গপুরে আসিয়া প্রথম দুই একদিন রোজগার মন্দ হয় নাই। দুই দিনে শতাধিক টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। পল্লীগ্রাম হইতে মোকর্দ্দমা প্রভৃতি উপলক্ষে কৃষক-শ্রেণীর যে সকল লোক সহরে আসে,—স্থানীয় ভদ্রলোকেরা যাহাদিগকে "বাহে" বলেন,—

তাহারা এ দুই দিন অনেকেই চারি আনার টিকিট লইয়া "তম্‌সা" দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু এ তামাসার কোনও স্ত্রীলোক না থাকায় তাহারা চটিয়া গেল। বলাবলি করিতে লাগিল— "না একটা বিটিছাওয়া, না কিছু, শুধুই পয়সা দিমু—হঃ!"— বিগত পৌষমাসে এখানে এক সার্কাস কোম্পানি আসিয়াছিল; গোলাপী রঙের গেঞ্জি পরিহিত যুবতীগণের ব্যায়ামলীলা দেখিয়া ইহারা খুব খুসী ছিল; এখন লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের বক্তৃতা ও বুজরুকি তাহাদের পছন্দ হইল না।

প্রতিদিন ঘর ভাড়া, তক্তপোষ ভাড়া, চারিজন লোকের আহারের ব্যয়, বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যয় ও তাহা বিতরণের জন্য গাড়ী ভাড়া, বাজনাওয়ালাদের মজুরি, টাউনহলের ভাড়া ও আলো—খরচ ত বড় সামান্য নয়! লোক না জুটিলে এমন ভাবে কয়দিন চলিবে? খরচপত্র কুলাইয়া প্রতিদিন অন্তত ২০।২৫ টাকা উদ্বৃত্ত না থাকিলে, বৈশাখ মাসে কন্যার বিবাহের আশা যে মরীচিকায় পরিণত হয়!—এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধের মনটি বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হে ভগবান! আর কষ্ট দিও না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলেগুলো ভারি জ্যাঠা হইয়াছে।

প্রথমে বাদ্যের, ক্রমে তাহার সহিত ছকড়ের চক্রশব্দ শ্রুতি-গোচর হইল; কুলদা ফিরিয়া আসিতেছে।

গাড়ী হইতে নামিয়া কুলদা গাড়োয়ান ও বাজনাওয়ালাদের ভাড়া প্রভৃতি মিটাইয়া দিয়া, আগামী কল্য ঠিক দুইটার সময় তাহাদের পুনরাবির্ভাব প্রার্থনা করিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই রামরতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইস্কুলে কি রকম হল?"

কুলদা ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "বড় সুবিধে নয়।"

"কোন্ কোন্ ইস্কুলে গিয়েছিলে?"

"জেলা ইস্কুল, টাউন ইস্কুল, কৈলাসরঞ্জন—তিনটেতেই গিয়েছিলাম। মোটে ৫২ খানি টিকিট বিক্রি হয়েছে।"

"তিনটে ইস্কুলে কিছু না হবে হাজার বারো শো ছেলে, মোটে ৫২ খানি টিকিট বিক্রি! সবই চার আনা বোধ হয়?"

কুলদা বলিল, "না, চার আনাও আছে, আট আনাও আছে।"—বলিতে বলিতে পকেটে হাত দিয়া সে গোটা কয়েক টাকা আধুলি ও সিকি বাহির করিয়া তক্তপোষের উপর রাখিল।

রামরতন সেগুলি গণিতে লাগিলেন। কুলদা বলিল, "ছেলে-গুলো বলে, ম্যাজিক আর দেখ্‌ব কি, ও ত আমরাও করতে পারি।"

রামরতন বলিলেন, "হ্যাঁঃ—ভারি ত মুরদ! কৈ, করুনা বেটারা, দেখি। ছেলেগুলোও সব জ্যাঠা হয়ে উঠ্‌লো। আমরা যখন ইস্কুলে পড়তাম, মনে আছে, ম্যাজিক হচ্চে শুনলে ত উন্মত্ত হয়ে উঠতাম। একেবারে হিতাহিত-জ্ঞান শূন্য। মায়ের ব্যাক্স ভেঙ্গে পয়সা নিয়ে ম্যাজিক দেখতে ছুটতাম। আর আজ ছোঁড়া-গুলো বলে কি না ম্যাজিক আর দেখ্‌ব কি! হায় রে কলিকাল!" —বলিয়া তিনি উদাস দৃষ্টিতে সম্মুখে রাজপথের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কুলদাও বিষণ্ণ মুখে তক্তপোষের একপ্রান্তে বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে বলিল, "আচ্ছা মামা, ইস্কুলের ছেলেদের অর্দ্ধমূল্য করে দিলে হয় না?"

রামরতন বলিলেন, "আসবে কি? যদি বেশী ছেলে আসে ত হাপ প্রাইসে আপত্তি নেই।"

কুলদা বলিল, "হাপ প্রাইস হলে অনেক ছেলে আসে বোধ হয়।"

"আচ্ছা, কাল থেকে না হয় তাই করে দাও। সকালে উঠেই হাণ্ডবিলটে ছাপতে দিয়ে এস।"

কুলদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ছাপাখানায় ২০।২২ টাকা বাকী পড়ে গেছে; তারা বলেছে ধারে আর ছাপবে না। কাল গোটা পনের টাকাও অন্ততঃ দিতে হবে।"

"দেখি আজ কি রকম হয়।"—বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পরদিন বিদ্যালয়ের বালকগণের জন্য টিকিট অর্দ্ধমূল্য করা হইল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিল না।

তৎপরদিন ঘোষিত হইল—"অদ্য শেষ রজনী! শেষ রজনী!! শেষ রজনী!!! সকলে আসুন, দেখুন, বিস্মিত হউন।" তাহাতে অন্য দিন অপেক্ষা গোটা ৫।৭৲ টাকা মাত্র বেশী পাওয়া গেল।

পরদিন আবার বিজ্ঞাপন বিলি হইল—"বহু সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ মহোদয়গণের বিশেষ অনুরোধে, প্রোফেসর বসু অদ্য তাঁহার যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। অদ্য রজনীতে নূতন নূতন খেলা, নূতন নূতন বিস্ময়, কেহ কখনও দেখেন নাই, শোনেন নাই, স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এই শেষ, এই শেষ, এই শেষ।" কিন্তু রঙ্গপুরের ভবী তাহাতেও ভুলিল না।

সে'দিন রাত্রে ম্যাজিক হইতে ফিরিয়া বাসায় আসিয়া রামরতন একখানি ডাকের পত্র পাইলেন। ইহা তাঁহার স্ত্রী লিখিয়াছেন।

পত্র পড়িয়া বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। স্ত্রী লিখিয়াছেন, ছোট মেয়েটির এগারো দিন জ্বর, ডাক্তার বলিয়াছে বিকারে দাঁড়াইতে পারে; ঘরে একটি পয়সা নাই, পাড়াপ্রতিবেশীর নিকট কর্জ্জ করিয়া দুইদিন ডাক্তারের ভিজিট দেওয়া হইয়াছে; অর্থাভাবে চিকিৎসা ও পথ্য দুই বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন—"তুমি যদি দিন কতকের জন্য একবার আসিতে পার ত বড়ই ভাল হয়। যদি নিতান্তই আসিতে না পার, তবে অন্ততঃ পঁচিশটি টাকা পত্রপাঠ মাত্র আমায় পাঠাইয়া দিবে, ইহাতে কোনমতে যেন অন্যথা না হয়।"

হরিদাস তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। রামরতন হুঁকা হাতে লইয়া বসিয়া রহিলেন। এই মেয়েটি তাঁহার বাড় আদরের; তাহার রোগশয্যা যেন চোখের সমুখে দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা-চক্ষে আদরিণী কন্যার রোগখিন্ন মুখখানি দেখিতে দেখিতে, তাঁহার বাস্তব চক্ষু দুইটিতে জল ভরিয়া আসিল।

কুলদা ম্যাজিকের পোষাক ছাড়িয়া বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া গোপনে তামাক খাইতেছিল। ভিতরে আসিয়া অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, কি হয়েছে?"

রামরতন চিঠিখানি ভাগিনেয়কে পড়িতে দিলেন। ঢিবরীর আলোকে ধরিয়া চিঠি পড়িয়া কুলদা বলিল, "কি করবেন?"

আজিকার টিকিট বিক্রয়ের টাকা লইয়া, তহবিলে মোটে ত্রিশটি টাকা আছে। এখানকার দেনা পাওনা মিটাইতেই তাহা প্রায় শেষ হইয়া যাইবে; চারিজনের রাহাখরচ কুলাইবে না।

রামরতন বলিলেন, "কাল সকালে উঠেই পোষ্ট আপিসে গিয়ে ২৫৲ টাকা টেলিগ্রাফ মনি অর্ডারে পাঠিয়ে দাও।"

কুলদা বলিল, "পাঠাতেও পাঁচসিকে খরচ। তার পর উপায়?"

রামরতন ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাতুলের মাথা খারাপ।

পরদিন বেলা ৯টার সময় কুলদা টাকা টেলিগ্রাফ করিয়া পোষ্ট আফিস হইতে ফিরিয়া দেখিল, মাতুল তক্তপোষে বসিয়া একমনে কি লিখিতেছেন। কাছে গিয়া দেখিল, অদ্যকার বিজ্ঞাপনের জন্য হ্যাণ্ডবিল রচনায় তিনি ব্যস্ত।

লেখা শেষ হইলে কাগজখানি ভাগিনেয়কে দিয়া রামরতন কহিলেন, "ছাপাখানায় যাও। তুমি বসে থেকে কম্পোজ করিয়ে, দুহাজার ছাপতে অর্ডার দিয়ে এস। যেন দুটোর মধ্যে পাই।"

কুলদা কাগজখানি পড়িতে পড়িতে বলিল, "কিন্তু আজ তাদের গোটা দশেক টাকা দেবো বলে' রেখেছিলাম যে, ছাপতে আবার গোলমাল না করে।"

রামরতন বলিলেন, "তাদের বোলো, কাল সকালে তাদের সমস্ত বাকী টাকা চুকিয়ে দেবো, পাইপয়সা বাকী রাখ্‌ব না।"

কুলদা পুনরায় হ্যাণ্ডবিলেরর খসড়া খানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এটা লিখে ত দিলেন, কিন্তু—কি রকম হবে—কিছু যে বুঝতে পারছিনে! শেষকালে একটা ধাষ্টমো না হয়।"

রামরতন রাগিয়া বলিলেন, "তু-তু তুমি ছাপিয়েই আন না! কি রকম হবে না হবে সে তখন জানতে পারবে। যাও, দেরী কোর না।"

কুলদা চিন্তিত মুখে প্রস্থান করিল। তাহার চিন্তার কারণ এই যে, হ্যাণ্ডবিলে অদ্য শেষতম—নিতান্তই শেষতম রজনীতে যে নূতন ম্যাজিক দেখাইবার কথা ঘোষণা করা হইতেছে, তাহা শুধু দর্শকমণ্ডলীর নহে—কুলদার পর্য্যন্ত অশ্রুতপূর্ব্ব। মাতুল এ ম্যাজিক এতাবৎকাল কোথাও দেখান নাই ; এমন কি তিনি প্রসঙ্গক্রমেও কখনও এ ম্যাজিকের উল্লেখ করেন নাই। অপর কোনও ম্যাজিকওয়ালা যে ইহা দেখাইতে পারে তাহা পর্য্যন্ত কুলদা কস্মিনকালেও শুনে নাই। সে ভাবিতে লাগিল, মাতুল এরূপ বিজ্ঞাপন কেন দিতেছেন? গতকল্য সারারাত্রি তিনি ঘুমান নাই। খালি ছটফট করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া তামাক খাইয়াছেন। দুশ্চিন্তায় তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি, কুলদা কিছুই বুঝিতে পারিল না। এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া লোক জড় করিয়া, শেষে ফাঁকি দিলে, অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না। রঙ্গপুরের ছাত্রগণ যেরূপ দুর্দ্দান্ত, প্রহার পর্য্যন্ত করিতে পারে!

যাহা হউক, মাতুলের হুকুম কুলদা তামিল করিতে গেল।

প্রেসের ম্যানেজার বাবু তখনও আসেন নাই। কম্পোজিটর-গণ বিজ্ঞাপনের কাপি পড়িয়া কুলদাকে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "হ্যাঁ মশায়, এ কি সত্যি?"

কুলদা গম্ভীর ভাবে বলিল, "সত্যি অবশ্য নয়, ইন্দ্রজাল।"

"সে আপনাদের ইন্দ্রজালই হোক চন্দ্রজাল হোক্,—এতে যা সব লেখা আছে, আমরা তা চোখে দেখতে পাব ত?"

"নিশ্চয় পাবেন।"

"তবে মশায়, আজকে আমাদের পাস দিতে হচ্চে। আমরা তিনজন কম্পোজিটর, জমাদার, আর ম্যানেজার বাবুও যেতে চাইবেন নিশ্চয় - এই পাঁচজনের পাস লিখে দিয়ে যান।"

"তা দিচ্চি। কিন্তু হ্যাণ্ডবিলগুলি ছুটোর মধ্যে চাই।"

"ছুটো কি বলছেন!—একটার মধ্যেই ছাপা হ্যাণ্ডবিল আপনাদের বাসায় আমরা পৌছে দেবো। পাসখানা লিখুন।"

বিজ্ঞাপনটিতে এইরূপ লেখা ছিল :—

শেষ রজনী শেষ রজনী

অদ্য নিতান্তই শেষ রজনী

বিপরীত ব্যাপার—লোমহর্ষণ কাণ্ড

অদ্য সর্ব্বজন সমক্ষে, প্রোফেসার বসু

একটা জীবন্ত মানুষ ধরিয়া

ভক্ষণ করিবেন

আবার ইন্দ্রজাল প্রভাবে সর্ব্বজনসমক্ষে

তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিবেন

ইত্যাদি

আহারাদি করিয়া, কুলদা বিজ্ঞাপন লইয়া গাড়ীতে বাহির হইল। রামরতন বাজাওলাদের বলিয়া দিলেন, "আজ তোরা খুব জোরে জোরে বাজাবি। কাল আমরা চলে যাব—তোদের ভাল করে বখশিস্ দিয়ে যাব।"

বেলা ২টা হইতে বিকাল ৫টা অবধি সহরময় বিজ্ঞাপনটি রাশি রাশি বিতরিত হইল।

ইহা পাঠ করিয়া সহরময় একটা হৈ হৈ ব্যাপার পড়িয়া গেল। অন্য দিনের ন্যায় অদ্যও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় খেলা আরম্ভ। কিন্তু ছ'টার সময় রামরতন বাসায় বসিয়া সংবাদ পাইলেন, টাউনহলের মাঠে ইতিমধ্যেই লোক জমিতে সুরু হইয়াছে। ভাগিনেয়কে বলিলেন, "ঠাকুরকে বল, চট্ পট্ তৈরী হয়ে নিক। রান্না যদি কিছু বাকী থাকে, নামিয়ে রাখুক, ফিরে এসে তখন হবে।"

খেলার সময় টিকিট বিক্রয়ের ভার এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের উপর। হরিদাস ও কুলদা গেটে বসিয়া থাকে, টিকিট লইয়া শ্রেণী অনুসারে দর্শকগণকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। রামরতন হরিদাসকে বলিলেন, "আমাদের ফার্ষ্টো কেলাস দু-টাকার টিকিট এক সারি চেয়ার ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আর, এক টাকার সেকেন কেলাস তিন সারি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, দড়ি খুলে, এই চার সারিই আজ ফার্ষ্টো কেলাস

বানিয়ে দিও। বাকী অর্দ্ধেকে সেকেন কেলাস, থার্ডো কেলাস, ফোর্থো কেলাস—ও কেলাসে দু' তিন সারি বেঞ্চি রেখ মাত্র।"

কুলদা বলিল, "তাতে চার আনার টিকিট বড্ড কমে যাবে যে!"

রামরতন বলিলেন, "তা যাক। গুণতি-মতন টিকিট নিয়ে বসবে। এক কেলাসের টিকিট ফুরিয়ে গেলেই, তার উঁচু কেলাসের টিকিট বেচবে।"

তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া, জিনিষপত্র ও লোকজন সহ রাম-রতন রওয়ানা হইলেন। টাউন হলে পৌঁছিয়া দেখিলেন, প্রাপ্ত সংবাদ মিথ্যা নহে,—মাঠে বিস্তর লোক টিকিটের জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বামুন ঠাকুর দ্বারের কাছে গিয়া টিকিট বিক্রয় করিতে বসিল। কুলদা ও হরিদাস গেটে বসিল। রাম-রতন ষ্টেজের উপর পর্দ্দার আড়ালে ম্যাজিকের সরঞ্জামগুলি গুছাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনুষ্য-ভোজন

সাড়ে সাতটার সময় পর্দ্দা উঠিলে রামরতন দেখিলেন, হল একেবারে কাণায় কাণায় পূর্ণ; প্রথম শ্রেণীর দুই টাকা মূল্যের

সমস্ত চেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; স্বয়ং পুলিশ সাহেব সস্ত্রীক প্রথম সারির মধ্যস্থলে উপবিষ্ট। অপরাপর শ্রেণীর সমস্ত আসনই পূর্ণ—উভয় পার্শ্বের দেওয়ালের নিকট বিস্তর লোক দণ্ডায়মান। ষ্টেজ হইতেই রামরতন ঝুঁকিয়া, পুলিশ সাহেব ও তদীয় মেমকে ভক্তিভরে সেলাম করিলেন।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমে তাসের কৌতুক। ষ্টেজ হইতে নামিয়া, প্রথম সারির দর্শকগণের সমক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রামরতন তাসক্রীড়া দেখাইতে লাগিলেন। তাহার পর ভৌতিক ফুলগাছ জন্মানো, দর্শকের ঘড়ি লইয়া চূর্ণীকরণ এবং অবশেষে তাহা অক্ষত অবস্থায় প্রত্যর্পণ, ছড়ির মধ্যে অঙ্গুরীয় প্রবেশ, কুলদাচরণকে হিপ্নটাইজ করিয়া এবং তাহার চোখ বাঁধিয়া তাহার কর্তৃক দর্শক-লিখিত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান ইত্যাদি মামুলি খেলাগুলি শেষ হইতে প্রায় নয়টা বাজিল।

অবশেষে রামরতন বলিলেন—

"ভদ্র মহোদয়গণ, এবার আমি একটা নূতন খেলা আপনা-দিগকে প্রদর্শন করিব—সেটি জীবন্ত মনুষ্যভক্ষণ। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার। ঔরংগজেব বাদশাহের আমলে জনৈক মুসল-মান ফকির কর্তৃক ইহা প্রথম প্রদর্শিত হয়। এই অত্যদ্ভুত ক্রীড়াটি ভারতীয় প্রতিভারই অক্ষয় কীর্ত্তি। পাশ্চাত্য যাদুকর-গণ ইহা অবগত নহে—ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয়। আমি বহু সাধনায় গুরুর নিকট ইহা শিক্ষা করিয়াছি। একটি মনুষ্যকে আপনাদের সমক্ষে ক্রমে ক্রমে আমি সম্পূর্ণ রূপে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব; এবং

অবশেষে উহাকে অক্ষত দেহে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব। দর্শকগণের মধ্যে কে ভক্ষিত হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসুন।"

রামরতন দর্শকমণ্ডলীর উপর তাঁহার সপ্রতীক্ষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সভামধ্য হইতে একটা গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল। এক মিনিট গেল, দুই মিনিট গেল, তিন মিনিট গেল,—কিন্তু ভক্ষিত হইবার জন্য কেহ অগ্রসর হইল না।

রামরতন তখন বলিলেন—"মহাশয়গণ, আপনারা কি ভয় পাইতেছেন? ভয়ের কোনও কারণ নাই। আমি মনুষ্যটিকে আহার করিয়া, আবার তাহাকে বাঁচাইয়া দিব। আপনারা তখন সকলেই দেখিবেন, তাহার দেহে কোনও আঘাতের চিহ্নমাত্রও নাই। কে আসিবেন, আসুন।"

রামরতন পূর্ণ দুই মিনিট কাল অপেক্ষা করিলেন। সভাস্থলে বহুলোকের চাপা গলায় কথা ও চাপা হাসির শব্দ শ্রুত হইল। কিন্তু কেহই খাদিত হইতে আগ্রহ দেখাইল না।

অবশেষে রামরতন বলিলেন, "আপনারা কি ভয় করিতেছেন যে পাছে আমি তাহাকে বাঁচাইয়া দিতে সমর্থ না হই? সে আশঙ্কা করিবেন না মহাশয়গণ, ইহা নির্দ্দোষ আমোদ মাত্র। আমি যদি খাইয়া আবার বাঁচাইয়া দিতে না পারি, তাহা হইলে ত আমি খুনী—খুনের দায়ে পড়িব। স্বয়ং ধর্ম্মাবতার পুলিস সাহেব বাহাদুর, পুলিসের বড় ইন্‌স্পেক্টর বাবু, স্থানীয় হাকিমগণের মধ্যে অনেকেই আজ দয়া করিয়া এখানে পদধূলি দিয়াছেন দেখিতেছি; যদি আমি

মানুষটিকে আবার বাঁচাইয়া দিতে না পারি, তবে ইঁহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া ফাঁসি দিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা ঘটিবে না। কোনও ভয় নাই কে আসিবেন আসুন।"

তৃতীয় শ্রেণীর একখানি বেঞ্চিতে কয়েকজন ছাত্র বসিয়া গোল-মাল ও হাসিতামাসা করিতেছিল; তাহারা ঠেলিয়া এক বালককে উঠাইয়া দিল। সে উঠিয়া ষ্টেজের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র, সমস্ত দর্শক তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

বালক ক্রমে ষ্টেজের পাদদেশে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাম-রতন বলিলেন, "উঠে এস বাবা, উঠে এস। কোনও ভয় নেই তোমার।"

বালকের বয়স পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ বর্ষ মাত্র। রঙ্গপুর টেক্‌নিক্যাল স্কুলে পড়ে, সাহসী বলিয়া সহপাঠী মহলে তাহার খ্যাতি আছে। কিন্তু ষ্টেজের উপর উঠিতে তাহার পা দুটি কাঁপিতে লাগিল।

রামরতন বালককে তাহার গাত্রবস্ত্র খুলিয়া ফেলিতে বলিলেন। দেহের ঊর্দ্ধভাগ নগ্ন করিয়া বালক দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার বুকটি দুরু দুরু করিতেছে, মুখখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে।

রামরতন দর্শকগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"দেখুন ভদ্র-মহোদয়গণ, আমি এই বালককে ভক্ষণ করি।"—বালকের দিকে চাহিয়া মাথা হেলাইয়া বলিতে লাগিলেন—"বাঃ বাঃ—খাসা নধর দেহ। অনেক দিন মানুষ খাইনি, কচি মাংস বেশ লাগবে খেতে।"

—বলিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া, তদ্দারা নিজ ওষ্ঠযুগল সিক্ত করিতে লাগিলেন।

হলভরা সমস্ত লোক একেবারে নিস্তব্ধ। একটি সূচ পড়িলে তাহার শব্দটুকু শুনা যায়। বালকের একবার ইচ্ছা হইল, সরিয়া পড়ে—কিন্তু লোকলজ্জায় সে তাহা করিতে পারিল না। উভয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কোনমতে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রামরতন সহসা বালকের স্কন্ধোপরি সজোরে এক কামড় বসাইয়া দিলেন।

"বাপরে—মারে—উহুহু"—বালকের এই আর্ত্ত চীৎকারে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। দর্শকগণের মধ্যে কয়েকজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "ওকি মশায়, ওকে কামড়ালেন কেন?"

রামরতন বলিলেন, "কামড়াব না ত খাব কি করে মশায়? অত বড় মানুষটা ত গপ্ করে গিলে খেতে পারিনে, একটু একটু করে আমায় খেতে হবে ত! সমস্তটা খাব, খেয়ে ইন্দ্রজালের জোরে আবার বাঁচিয়ে দেব।"

ইহা শ্রবণমাত্র, বালক ষ্টেজ হইতে এক লম্ফ দিয়া, খোলা দরজায় দণ্ডায়মান প্রহরীকে ঠেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

হলের ভিতর তখন মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। কেহ কেহ উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল—"এ কি জুচ্চুরি না কি মশায়? ইন্দ্রজালের প্রভাবে খাবেন ত কামড় দিলেন কেন? সব বুঝি ফাঁকি?"

রামরতন দেখিলেন, হলের অধিকাংশ লোকই অত্যন্ত উত্তে-

জিত হইয়া উঠিয়াছে, কেবল পুলিশ সাহেব ও তাঁহার মেম মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। রামরতন কহিলেন, "কেন মশায়, ফাঁকিটা আমি কি দিলাম? বিজ্ঞাপন পড়ে দেখুন, ইন্দ্রজাল প্রভাবে খা'ব বলিনি, ইন্দ্রজাল প্রভাবে বাঁচিয়ে দেবো বলেছি। আগে খাই, তবে ত বাঁচাব। যার ইচ্ছে হয় আসুন না, বিজ্ঞাপনে যে খেলা দেখাব বলেছি তাই দেখাচ্চি।"

দর্শকগণ উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিল, "থাক্ থাক্ ঢের হয়েছে, আর খেলা দেখাতে হবে না। আমরা তোমায় কি রকম খেলা দেখাই তা দেখ। হল থেকে বেরোও দিকিন একবার জোচ্চোর ক্যাহেকা!"

রামরতন ক্রন্দনের মত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ—অ্যাঁ তোমরা আমায় মারবে না কি? মারবে নাকি? কেন, আমি কি দোষ করেছি? (যোড়হস্তে পুলিস সাহেবের পানে চাহিয়া) দোহাই গবর্ণমেণ্টের, দোহাই ইংরেজ বাহাদুরের—আমি নির্দ্দোষী। তোমরা আমার হাণ্ডবিল পড়ে দেখ, আমি কি জুচ্চুরি করেছি?"

পুলিস সাহেব তাঁহার মেমকে হাসিতে হাসিতে কি বলিতেছিলেন, রামরতনের ক্রন্দন ও দোহাই শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "এ বুড়া টুমি ভয় করিও না। কেহ টোমায় মারিটে পারিবে না। (পশ্চাৎ ফিরিয়া) বাবুলোগ, টোমরা সব চুপ্‌চাপ আপন আপন গৃহে গমন কর। বে-আইন জনটা করিলে গ্রেফ্‌টার হইবে।"

অতঃপর দর্শকগণ গজগজ করিতে করিতে উঠিয়া বাহির হইতে লাগিল। পুলিস সাহেব চুরুট মুখে করিয়া তথায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হল খালি হইয়া গেলে, রামরতন ষ্টেজ হইতে নামিয়া পুলিস সাহেব ও তাঁহার মেমকে দুই দীর্ঘ সেলাম করিয়া, করযোড়ে বলিলেন, "আজ হুজুর ছিলেন বলেই অধীনের প্রাণ বাঁচলো। আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্যে যদি দয়া করে দুজন কনেষ্টাবল হুকুম করে দেন তবে ভাল হয়; কি জানি রাস্তায় যদি—"

পুলিস সাহেব রামরতনের স্কন্ধে মৃদু মৃদু করাঘাত করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"টুমি বড় শয়টান আছ—A down-right scoundrel। পুলিসের উপযুক্ট লোক। টোমার বয়স কম হইলে আমি টোমায় পুলিশে ডারোগা কার্য্য দিট। এখন গৃহে যাও—কল্য প্রাটেই টুমি রঙ্গপুর পরিট্যাগ করিয়া যাইবে।" —মেমসাহেবও হাসিতেছিলেন।

পুলিস সাহেবের হুকুম অনুসারে তথায় উপস্থিত দুইজন কনেষ্টবল রামরতনকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিল।

পরদিন পাওনাদারগণের প্রাপ্য নিঃশেষে চুকাইয়া দিয়া, বাকী টাকার রাশি পুটুলি বাঁধিয়া লইয়া, রামরতন রঙ্গপুরের মায়া পরিত্যাগ করিলেন। গৃহে পৌঁছিয়া দেখিলেন, ঈশ্বরকৃপায় মেয়েটির পীড়ার অনেকটা উপশম হইয়াছে।

কালিদাসের বিবাহ

(পশ্চিমাঞ্চলের কিংবদন্তী)

[বাঙ্গালা দেশে কালিদাসের বিবাহ সম্বন্ধে যে গল্পটি প্রচলিত আছে তাহা সংক্ষেপে এই ঃ—গৌড়াধিপতি মাণিকেশ্বরের রত্নাবতী নাম্নী অত্যন্ত রূপবতী ও বিদুষী এক কন্যা ছিলেন। বিচারে যিনি তাঁহাকে পরাস্ত করিবেন, তাঁহাকেই স্বামিত্বে বরণ করিবেন, রত্নাবতী এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। বড় বড় পণ্ডিতেরা বিচারে হারিয়া গিয়া ক্রোধে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এক মহামূর্খকে আনিয়া রাজকন্যার সহিত বিবাহ দেওয়াইয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। তদনুসারে তাঁহারা অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া, দেশ-ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে দেখিলেন, এক ব্যক্তি গাছের ডালে বসিয়া সেই ডাল কাটিতেছে। সুতরাং তাহাকেই তাঁহারা আদর্শ মূর্খ স্থির করিয়া গৌড়ে লইয়া আসিলেন, এবং কৌশলে রাজকন্যাকে বিচারে পরাস্ত করাইয়া দিয়া তাহার সহিত বিবাহ দেওয়াইলেন। এই বরই ভবিষ্যতের কবি-বর কালিদাস। ফুলশয্যার রাত্রেই রাজকন্যা বুঝিতে পারিলেন তাঁহার বরটি কত বড় মূর্খ—ক্রোধে তাঁহাকে পদাঘাত করিলেন। অপমানিত কালিদাস তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, অরণ্যমধ্যে মায়াবেশধারিণী দেবী সরস্বতীর দর্শন পাইলেন এবং তাঁহাকে অর্চনা করিয়া, অসামান্য কবিত্বশক্তির অধিকারী হইলেন। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তী ভিন্ন রূপ ; নিম্নে আমরা গল্পাকারে তাহা প্রকাশ করিলাম।]

পুরাকালে বঙ্গদেশে সত্যবান নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার একটি কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহার নাম চম্পক-কলিকা।

মেয়েটি বড়ই সুন্দরী—তাহার রঙটি যেন চাঁপাফুলের কুঁড়ির মত, সেই জন্যই তাহার ঐরূপ নামকরণ হয়। মা-বাপে কখনও তাঁহাকে 'চম্পা', কখনও বা শুধু 'চাঁপা' বলিয়া ডাকিতেন।

চাঁপা জন্মিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, রাজার প্রধান মন্ত্রীর একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল—তাহার নাম চূড়ামণি। প্রধান মন্ত্রীর দাসী, চূড়ামণিকে কোলে করিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া যাইত; রাণীমা ছেলেটিকে কোলে করিতেন, সন্দেশ খাইতে দিতেন।

ক্রমে চম্পা বড় হইল। তখন চূড়ামণি রাজবাড়ী গিয়া চম্পাকে কোলে করিত; তাহার সহিত খেলা করিত। চাঁপা আধ আধ কথায় তাকে "চুলো দাদা" বলিয়া ডাকিত।

ক্রমে চাঁপা আরও বড় হইল। রাজা তাহাকে পাঠশালায় পড়িতে পাঠাইলেন। চাঁপার বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি দেখিয়া গুরু-মহাশয় অবাক্ হইয়া গেলেন। অন্য পড়ুয়ারা বলিতে লাগিল—"তা হবে না? হাজার হোক রাজার মেয়ে ত!"

চূড়ামণিও সেই পাঠশালায় পড়িত; কিন্তু লেখাপড়ায় তাহার তাদৃশ মন ছিল না। চাঁপা যখন পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়, চূড়ামণি সে সময় অনেক উপরে পড়িত; কিন্তু দুই তিন বৎসর মধ্যেই চাঁপা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহাকে ছাড়াইয়া গেল। ইহাতে চূড়ামণি মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল বটে; কিন্তু চাঁপার সহিত ছেলে-বেলা হইতে তাহার যেমন ভাবটি ছিল, তাহার খর্ব্বতা হইল না। চাঁপা কিন্তু মনে মনে বলিত—"ঐ চূড়োদাদা ভারি গাধা!"

চূড়ামণি ছেলেটি দেখিতে কিছু মন্দ ছিল না—তবে রঙটি

তাহার শ্যামবর্ণ। রাজকন্যা আড়ালে বলিত—"মাগো—কি কালো!" তাহার আর একটু দোষ ছিল—সে একটু তোৎলা। তবে সাধারণতঃ তাহার তোৎলামি বড় জানা যাইত না—রাগিলেই তাহা বৃদ্ধি পাইত। চম্পা মাঝে মাঝে "চূড়োদাদা"র অসাক্ষাতে তাহার তোৎলামিকে ভেঙাইয়া আনন্দ পাইত।

২

রাজকন্যার বয়স তখন নয় কি দশ, চূড়ামণির বয়স চৌদ্দ বৎসর। একদিন পাঠশালার পর রাজোদ্যানে চাঁপা ও চূড়ামণি খেলা করিতেছিল—রাজকন্যার দাসী সে সময়টা কোথা গিয়াছিল; চূড়ামণি রাজকন্যাকে বলিল, "চাঁপা, তুই আমায় বিয়ে করবি?"

কথাটা শুনিবামাত্র চন্ করিয়া রাজকন্যার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কি বল্লে চূড়ামণি?" বিরক্ত হইলে, সে আর 'চূড়ো দাদা' বলিত না।

চূড়ামণির বুদ্ধিটা ছিল কিছু মোটা;—চাঁপা যে তাহাকে 'চূড়ামণি' বলিল, তাহা সে অত খেয়াল করিল না। ভাবিল, রাজকুমারী বোধ হয় শুনিতে পান নাই। তাই সে প্রশ্নটার পুনরুক্তি করিয়া বলিল, "চাঁপা বলি শোন্—যদি আমাকেই বিয়ে করতে তোর ইচ্ছা হয়, তবে এক কায করিস্।"

চাঁপা তাহার রাগের কোনও লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ না করিয়া বলিল, "কি কায?"

"তুই যখন বড় হবি, তোর বাবা এখানে সেখানে তোর বিয়ের

সম্বন্ধ করবেন, সেই সময় তুই তোর বাবাকে বলিস্—আর যদি বাবাকে বলতে লজ্জাই করে—তোর মাকেই বলিস্ না হয়, যে মা, আমার অন্য কোথাও সম্বন্ধ কোর না; আমি ঐ চূড়ো দাদাকেই বিয়ে করব। তা' হ'লেই, বুঝেছিস, আমার সঙ্গেই তাঁরা তোর বিয়ে দিয়ে দেবেন। সে বেশ মজা হবে—না ভাই? কি বলিস্, তোর মন আছে?"

চাঁপা আর রাগ সামলাইতে পারিল না। বলিল, "চূড়ামণি, তোমার আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়!"

চূড়ামণি একথা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইল। রাজকন্যার পানে চাহিয়া বলিল, "কেন? আস্পর্দ্ধাটা কি হল?"

চাঁপা বলিল, "তোমার বাবা আমার বাবার চাকর, তুমি চাও আমায় বিয়ে করতে? বামন হয়ে চাঁদে হাত! আমি হলাম রাজার মেয়ে, আমার বিয়ে হবে মস্ত বিদ্বান্ রূপবান্ কোন রাজপুত্রের সঙ্গে! তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে? বলতে লজ্জা করে না?"

এই কথা শুনিয়া চূড়ামণিরও রাগ হইয়া পড়িল। বলিল, "ওঃ রাজপুত্তুর বি-বিয়ে করবে তুমি? বটে! বলি, কোন রাজ-পুত্তুরকে বিয়ে করবে বল দেখি? কা-কা-কার কপাল ফিরল?"

চাঁপা বলিল, "সে, যার সঙ্গে যার ভবিতব্যতা আছে, তার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। কিন্তু তোমার মুখে এ ব্যঙ্গ শোভা পায় না চূড়ামণি! যারা চাকর বাকর, তারা চাকর বাকরের মত থাক্‌লেই ভাল হয়।"—বলিতে বলিতে চম্পার মুখখানি রাঙা টক্‌টক্ করিয়া উঠিল।

চূড়ামণি বলিল, "আ-আমার মত সুপাত্র তোমার অদৃষ্টে নেই; কাযেই দু-দুষ্টু সরস্বতী তোমার স্কন্ধে ভর করে' তোমার মু-মুখ দিয়ে ঐ সকল কথাগুলো বলালেন। নি-নি-নি-নিজের পায়ে নিজে কেউ কুড়ুল মারলে, অন্য লোকে আর কি-কি-কি করবে বল! আমি বুঝি হলাম 'চাকর বাকর!' বলি রা রাজকন্যে, তো-তোমার বাবার এই রা-রাজ্যটা চালাচ্চে কে? সে খবর রাখ কি? তোমার বাবার ত ভারি মু-মু-মুরুদ কিনা?—আমার বাবা না থাকলে, এ রাজ্য যে এতদিন কবে লো-লো-লোপাট হয়ে যেত! তোমার বিয়ের স-স-সময় হলে, তোমার বাবা ত আমার বাবাকেই পা-পা-পা-পাত্র খুঁজে আনতে বলবেন!—তুমি দেখো তখন কেমন এক পা-পাত্র নিয়ে আসি তোমার জন্যে! এর শোধ সেই সময় যদি না তুলি, তবে আমার নাম চূ চূ-চূড়ামণিই নয়!"

রাজকন্যা ব্যঙ্গভরে হাসিয়া বলিল, "কি শোধটা তুলবে চূড়ামণি?"

চূড়ামণি ইহাতে আরও চটিয়া বলিল, "কি শোধটা তু-তুলব, শুনবে তুমি?—আজ থেকে আমার এই পি-পি-পিতিজ্ঞে রইল, একজন আকাট গ-গণ্ড মুখ্যু গরীবকে এনে তোমার সঙ্গে বি বিয়ে দেওয়াব তবে ছাড়ব। তা-তা-যদি আমি না পারি, তু-তু-তুমি ছুরি দিয়ে আমার এই কা-কা-কাণ দুটি কে-কে-কে-কে-কে-কেটে নিয়ে তোমার শোবার ঘরের দে-দে-দেওয়ালে পে-পে-পেরেক পুঁতে টা-টা-টাঙ্গিয়ে রেখ।"

চাঁপা ওষ্ঠ ও নাসিকা স্ফীত করিয়া বলিল, "যে লম্বা লম্বা কাণ, দেওয়ালে টাঙ্গালে মেঝেয় লুটোবে যে!"

"আ-আ আমার কা-কা"—করিয়া চূড়ামণি কি বলিতে যাইতেছিল। তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়া, বেণী দুলাইয়া ক্ষিপ্রপদে চাঁপা তথা হইতে চলিয়া গেল।

৩

বর্ষের পর বর্ষ কাটিতে লাগিল। রাজকন্যা অন্তঃপুরচারিণী হইলেন, চূড়ামণির সহিত আর তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় না। অন্তঃপুরেই তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায়ে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বালিকা ক্রমে নবযুবতী হইয়া উঠিলেন।

চূড়ামণি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে; সে এখন তাস পাশা খেলিয়া, গুড়ুক ফুঁকিয়া, আড্ডা দিয়া বেড়ায়। রাজকন্যা সে বাল্য-কলহ বহুকাল বিস্মৃত হইয়াছেন—কিন্তু চূড়ামণি তাহা মনে পুষিয়া রাখিয়াছে।

রাজা সত্যবান একদিন তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে ডাকিয়া, কন্যার জন্য একটি যোগ্য পাত্র অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা দিলেন।

মন্ত্রী গৃহে আসিয়া পুত্রের নিকট রাজাদেশের কথা জানাইয়া বলিলেন, "পূর্ব্বকালে নিয়ম ছিল, রাজার ছেলেমেয়ের বিবাহের জন্যে দেশে দেশে ভাট পাঠানো হত। ইনি ভাট না পাঠিয়ে আমাকেই যেতে হুকুম করলেন! আমার একে এই বুড়ো শরীর, তায় অম্বলের ব্যারাম, সাত দেশ ঘুরে বেড়াবার এই কি আমার বয়স?

রাজার যেমন কাণ্ড!"—বলিয়া বৃদ্ধ মুখখানি অত্যন্ত কাতর করিয়া রহিলেন।

চূড়ামণি বলিল, "ঠিক কথাই ত বাবা! আপনি বুড়ো হয়েছেন, এখন কি আর দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ানো আপনার পোষায়? আপনি বাড়ীতে থাকুন, আমিই বরং যাই, ভাল দেখে একটি পাত্র খুঁজে আনি।"

মন্ত্রী বলিলেন, "আচ্ছা, তবে রাজাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করি।"

রাজা সত্যবান এ প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা বলেছ। তুমি গেলে এ রাজ্য চালায় কে? তা বেশ ত, চূড়ামণিই যাক্। চম্পার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই ওর ভাব—দুটিতে ভাইবোনের মত খেলা করেছে। ও নিশ্চয় খুব ভাল পাত্রই আনবে।"

চূড়ামণি রাজাজ্ঞা পাইয়া, চম্পার জন্য বর খুঁজিতে বাহির হইল। দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া, একজন আদর্শ মূর্খের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনেক দিন কাটিল, কিন্তু মনের মতনটি কাহাকেও পাইল না।

অবশেষে একদিন এক বনের মধ্যে দিয়া যাইতে যাইতে, চূড়ামণি দেখিল, গলে যজ্ঞোপবীত, সুন্দর সুগঠিত দেহ এক যুবক বৃক্ষের শাখায় বসিয়া, সেই শাখারই মূলদেশ কর্ত্তন করিতেছে। দেখিয়া চূড়ামণি উল্লসিত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, "হাঁ—এই উপযুক্ত পাত্র বটে। রাজকন্তের জন্যে বর খুঁজতে বেরিয়ে অনেক মূর্খই দেখলাম, কিন্তু এটির মত কেউ নয়।" যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওহে, এস এস নেমে এস;—একটা কথা বলি শোন।"

যুবক নামিয়া আসিয়া চূড়ামণির পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

চূড়ামণি জিজ্ঞাসা করিল, "গাছের ডালটি কাটছিলে কেন?"

"আমার কাঠের দরকার।"

"কাঠ কি হবে?"

"কাঠ আবার কি হয়? উননে দিয়ে রান্না করতে হয়!"

চূড়ামণি বলিল, "হেঁ হে—তাও ত বটে! তোমার নাম কি হে ছোকরা?"

যুবক বলিল, "কালিদাস।"

"কালিদাস? বেশ বেশ। কি জাত? গলায় ত পৈতে দেখছি, ব্রাহ্মণ বুঝি?"

"এজ্ঞে।"

"কি কর? পড়াশুনো কিছু কর?"

"এজ্ঞে পাঠশালায় একবার ভর্ত্তি হয়েছিলাম। গুরুমশাই বড্ড মারে তাই ছেড়ে দিয়েছি।"

চূড়ামণি বলিল, "বেশ বেশ। তোমাদের বাড়ী কোথায়? বাপের নাম কি?"

উত্তরে যুবক নিজ পরিচয় দিল। নিকটেই গ্রামে বাড়ী, বাল্যকালেই পিতৃমাতৃবিয়োগ হইয়াছে, লেখাপড়া সে কিছুই শেখে নাই—শিখাইবেই বা কে? গ্রামের লোকের গোরু চরাইয়া দিনপাত করে। বিবাহ হয় নাই।

চূড়ামণি মনে মনে বলিল, "ছেলেটির যে রকম ভাল চেহারা,

একে যদি আমি রাজপুত্র বলে' চালিয়ে দিই ত হঠাৎ কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।"

যুবক বলিল, "এই কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে গাছ থেকে আমায় নামালে? না, আর কোনও কথা আছে?"

চূড়ামণি বলিল, "আছে। বিয়ে করবে?"

"কাকে?"

"আমাদের রাজার মেয়েকে?"

"রাজার মেয়ে? তা মন্দ হবে না। আমরা কিন্তু কুলীন; কি পাব?"

"ধন দৌলৎ ঢের পাবে। যত চাও।"

যুবক একটু ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "সে যেন হল। কিন্তু মেয়েটি কেমন?"

"পরমা সুন্দরী। রাজার মেয়ে, বুঝছ না! গায়ের রঙটি যেন চাঁপা ফুলের মত। মুখখানি যেন পূর্ণিমের চাঁদ। যেমন চোখ, তেমনি নাক, তেমনি ঠোঁট—একবারে পরী হে পরী! করবে বিয়ে?"

যুবক সোল্লাসে বলিল, "করব। কোথা সে মেয়ে?"

"আমার সঙ্গে এস তবে।"—বলিয়া চূড়ামণি কালিদাসকে সঙ্গে করিয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

রাজধানীর পদতলবাহিনী নদীতীরে পৌছিয়া চূড়ামণি কালিদাসকে সেই নদীতে স্নান করাইয়া, উত্তমোত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া, নিকটস্থ এক মন্দিরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া বলিল, "তুমি

এখানে চুপটি করে বসে থাক। আমি সহরে গিয়ে তোমার জন্তে হাতীঘোড়া লোকলস্কর সব পাঠিয়ে দিচ্চি—তুমি যেও। কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান করে দিই, কারুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বেশী কোয়ো না—খুব গম্ভীর মেজাজে বসে থাকবে। বুঝেছ?"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া কালিদাস সেখানে বসিয়া রহিলেন। চূড়ামণি নগরে গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল, "মগধ দেশের যুবরাজকে পাত্র স্থির করে, তাঁকে নিয়ে এসেছি। অমুক মন্দিরে তিনি অপেক্ষা করছেন—তাঁকে আনবার জন্যে হাতীঘোড়া লোকলস্কর পাঠিয়ে দিন।"

এ সংবাদে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ যান-বাহনাদি প্রেরণ করিলেন। বর আসিলে সকলেই দেখিল—অতি সুন্দর যুবাপুরুষ—রাজকন্যার উপযুক্ত পাত্র বটে।

চারি দিবস ব্যাপিয়া "লগন্" উৎসব চলিল। চম্পক-কলিকা ইতিমধ্যে বর দেখিবার জন্য গোপনে এক দাসী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বর অত্যন্ত সুপুরুষ শুনিয়া তিনিও খুসী হইলেন।

পঞ্চম দিনে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

রজনীতে কালিদাস শয়নমন্দিরে নীত হইলেন। সুবর্ণময় পালঙ্কে পুষ্পসুকোমল শয্যায় শয়ন করিবামাত্র, তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকন্যা সোণার থালায় করিয়া "পঞ্চারতি" লইয়া প্রবেশ করিলেন।

বরকে নিদ্রিত দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। জাগা-

ইবার অভিপ্রায়ে, মল ঝম্‌ঝম্ করিয়া এদিক ওদিক একটু বেড়াই-লেন; কিন্তু বরের ঘুম ভাঙ্গিল না। রাজকন্যা তখন বরের নাসিকার নিকট সুগন্ধি পুষ্পগুচ্ছ ধরিলেন—তাহাতেও বর জাগিল না। তাহার পর, গোলাপ-পাশ লইয়া সুশীতল গোলাপজল বরের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন—তাহাতেও কোন ফল হইল না। বর না জাগিলে "পঞ্চারতি" * করিবেন কেমন করিয়া? তাই লজ্জার মাথা খাইয়া, বরের গায়ে হাত দিয়া তিনি ডাকিতে লাগি-লেন—"ওগো—শুনছ?"

কেই বা শোনে!—কালিদাস গভীর নিশ্বাস লইতে লইতে আরোমে নিদ্রা যাইতেছেন।

রাজকুমারী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"এই কি মগধের রাজপুত্র!—এ ত বাপের জন্মে ভাল বিছানায় শোয়নি বলে বোধ হচ্চে।"—মনে মনে তাঁহার রাগ হইতে লাগিল। অব-শেষে তিনি পালঙ্ক হইতে নামিয়া, বরের হাত ধরিয়া সবলে এক 'হেঁচকা টান' মারিলেন।

কালিদাস উঠিয়া বসিলেন। রাজকুমারীর ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল। বলিলেন, "অ্যাঁ! অ্যাঁ! এটা আপনার বিছানা বুঝি? আমি ভুলে এখানে এসে শুয়েছি বুঝি? আমার

---

* পশ্চিমাঞ্চলে ফুলশয্যার রাত্রে কন্যা, একটি থালায় করিয়া মাল্য চন্দন তাম্বুল প্রভৃতি লইয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া, স্বামীকে "আরত্তি" করিয়া থাকেন।

মাফ্ করুন, আমি ত জানতাম না; রাজভৃত্যেরা বল্লে, তাই এখানে শুলাম। আমি এখনি চলে যাচ্ছি।"

ক্রোধে রাজকন্যার বাক্যস্ফুরণ হইল না। হস্তদ্বারা ইঙ্গিতে তিনি কালিদাসকে যাইতে নিষেধ করিলেন। ক্রোধ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইলে বলিলেন, "ভুল করনি—এ তোমারই শয্যা বটে। আমায় 'আপনি আপনি' বোলো না—আমি তোমার স্ত্রী। চোখের ঘুম ছাড়লো?—একটু বেড়াবে এসনা।"

সে সমস্ত মহালটাই রাজকন্যার—সে রাত্রে সেখানে আর জন-প্রাণী নাই। রাজকন্যা প্রথমে স্বামীকে স্বীয় পাঠমন্দিরে লইয়া গেলেন। তথায় কাব্য অলঙ্কার পুরাণ ইতিহাস নানা গ্রন্থ রক্ষিত আছে—তাহার মলাটগুলি সোণা রূপার পাতে মোড়া, হীরা মোতি চুনী পান্না খচিত। কালিদাস একখানি পুঁথি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "এটা কি গো? বেশ চক্‌চক্ করছে ত!"

রাজকন্যা বলিলেন, "ও একখানি কাব্য।"

কালিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাব্য কি? এতে কি হয়?"

রাজকন্যা বলিলেন, "পড়তে হয়।"

কালিদাস বলিলেন, "পড়তে হয়? ওঃ—বুঝেছি—ক-খ'র বই। আমি ছেলেবেলায় ক-খ শিখেছিলাম, এখন ভুলে গেছি।"

রাজকন্যা কোনও উত্তর না দিয়া, বিরক্তিভরে কক্ষান্তরে চলি-লেন। কালিদাসও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি যাহা দেখেন, তাহারই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন—"এটা কি গো? এতে কি হয়?" রাজকন্যা মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এই মগধের রাজপুত্র!

যাহা দেখিতেছে, সবই ইহার পক্ষে নূতন? জীবনে এ কি কিছুই দেখে নাই?"

পরে রাজকন্যা চিত্রশালায় প্রবেশ করিলেন। বড় বড় চিত্রকরগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত রামায়ণ মহাভারতাদির নানা চিত্র তথায় শোভা পাইতেছে। কালিদাস যে ছবিই দেখেন, তাহারই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন—"এটা কি গো?"—রামায়ণ মহাভারতের কোন চিত্রই কালিদাস চিনিতে পারিলেন না।

অবশেষে নবদম্পতী একখানি বৃন্দাবন-চিত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় বসিয়া রাধিকার মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছেন—কিয়দ্দূরে বড় বড় গোরু চরিতেছে। এই প্রথম কালিদাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন—"আহা! —কিবে গাইগুলি! কিবে বাঁট!—আঃ, ইচ্ছে করছে একটা বোগ্‌নো নিয়ে চ্যাক্‌চোক্ করে দুধ দুই।"

রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুধ দুইতে জান না কি?"

কালিদাস বলিলেন, "তা আর জানি নে!—গোরু চরিয়ে আর দুধ দুয়েই ত এত বড়টা হলাম!"

রাজকুমারী বিস্মিতভাবে স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। কৌশলে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিদাসের জন্মেতিহাস, চূড়ামণির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন—সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, ললাটে করাঘাত করিয়া নিকটস্থ পর্য্যঙ্কপ্রান্তে তিনি বসিয়া পড়িলেন।

তখন সহসা সেই বাল্যকালের কথা—চূড়ামণির সহিত কলহ

—তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। বুঝিলেন, চূড়ামণিই তাঁহার এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে।

ক্রোধে ক্ষোভে অভিমানে রাজকন্যা আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বাঙ্গে যেন বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল—এই মূর্খ বর্ব্বরের সঙ্গে চিরজীবন কি করিয়া আমি কাটাইব!

অদূরে ভিত্তিগাত্রে একখানি তরবারি ঝুলিতেছিল, সেই দিকে হঠাৎ রাজকন্যার দৃষ্টি পড়িল। চক্ষের পলকে তিনি উঠিয়া সেই তরবারি গ্রহণ করিয়া, কালিদাসের শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন।

কালিদাস দুই লম্ফে পিছাইয়া গিয়া বলিলেন, "এ কি! আমায় কাট কেন?"

রাজকন্যা প্রবলভাবে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে।"

কালিদাস বলিলেন, "বাঃ—মজার লোক তুমি! আমি মর্‌লে তুমি বিধবা হবে না?"

"বিধবা হব সেও ভাল। সারাজীবন তোমায় নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে, বিধবা হয়ে থাকাও ভাল।"

কালিদাস বলিলেন, "কেন, আমায় নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরবে কেন? আমার অপরাধ?"

রাজকন্যা বলিলেন, "তুমি যে মূর্খ!"

কালিদাস বলিলেন, "ওঃ—আমি মূর্খ, তাই তোমার যোগ্য

নই? বুঝেছি। আচ্ছা, তুমি আমার প্রাণে মেরো না। আমায় যদি তুমি সহ্য করিতে না পার, আমি চলে যাচ্ছি।"

রাজকুমারী ঝনৎকারের সহিত তরবারি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। উন্মুক্ত দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন "যাও—দূর হয়ে যাও।" তাঁহার গ্রীবা উন্নত, বক্ষ ঘন ঘন স্ফীত হইতেছে, দুই চক্ষু দিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা উছলিয়া পড়িতেছে।

কালিদাস তৎক্ষণাৎ রাজবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

রাজপথগুলি অতিক্রম করিয়া, রাজধানীর বাহির হইয়া, যে দিকে দুই চক্ষু যায়, কালিদাস সেই দিকে চলিতে লাগিলেন।

রাজধানী হইতে কিছু দূরে এক অরণ্য ছিল। কালিদাস ভাবিলেন—"লোকালয়ে মুখ দেখাইবার আমার আর প্রয়োজন নাই। বনের মধ্যেই প্রবেশ করি, বাঘে ভালুকে আমায় খাইয়া ফেলুক সেই ভাল। স্ত্রী যাহাকে মূর্খ বলিয়া কাটিতে যায়, তাহার জীবনে ধিক্! বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরিয়া যাওয়াই তাহার শত গুণে ভাল।"—অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া কালিদাস ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঘ ভালুকের সাক্ষাৎ পাইলেন না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। জঙ্গলের ফল খাইয়া, গাছ-তলায় শুইয়া, কয়েকদিন কাটাইলেন।

এইরূপে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে কালিদাস একদিন কালীচন্দ্র নামক এক যোগিপুরুষের সাক্ষাৎ পাইলেন। কালিদাসের সেবায় ও স্তবস্তুতিতে যোগী প্রসন্ন হইয়া, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিদাস নিজ ইতিহাস—বিবাহ,

ৰ্ত্তক অপমানিত হওয়া প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাকে জানাইয়া
ন, "প্রভু, আমি মহামূর্খ। আমার মূর্খত্ব কিসে ঘুচে,
তাহা বলিয়া দিন।"

যাগিপুরুষ ধ্যানস্থ হইয়া, ভবিষ্যতের সমস্ত কথাই অবগত
ান। ধ্যানভঙ্গে তিনি বলিলেন, "বৎস, তুমি বনে আসিয়াছিলে
তোমায় খাইয়া ফেলুক এই মনে করিয়া। বাঘের সাধ্য
পৃথিবীতে তুমি অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে। এই নশ্বর
নান্তে যশঃশরীরে তুমি অমর হইয়া থাকিবে। বনের বাঘের
া কি বলিতেছ, কালরূপী মহাব্যাঘ্রও তোমায় খাইতে পারিবে
ঐ সরোবরে তুমি স্নান করিয়া এস, আমি তোমায় রবি-মন্ত্র
তেছি। তুমি আমার নিকটে থাকিয়া সেই মন্ত্র একাগ্রচিত্তে জপ
র—তোমার উপর দৈবকৃপা বর্ষিত হইবে।"

কালিদাস স্নান করিয়া আসিয়া, রবি-মন্ত্র গ্রহণান্তর জপ করিতে
বসিলেন।

ক্রমে রাজধানীতে সংবাদ পৌছিল, বনমধ্যে কালীচন্দ্র
নামে এক মহাযোগীর আবির্ভাব হইয়াছে। দলে দলে লোক
তাঁহাকে দেখিতে ও প্রণাম করিতে আসিতে লাগিল।

কালিদাসের মন্ত্র জপের শেষ দিন, রাজকন্যা চম্পককলিকাও
সখিগণ সহ যোগিদর্শনে আসিলেন। যোগী তখন স্থানান্তরে
গিয়াছিলেন, কালিদাস বসিয়া মন্ত্রজপ করিতেছিলেন। জপের
নির্দ্দিষ্ট কাল তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই, কিন্তু অধিক বিলম্ব ছিল না।

রাজকন্যা সখিগণ সহ আশ্রমের অদূরে দাঁড়াইয়া, জপনিরত

যুবকটিকে দেখিতেছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে তখন কবিত্ব-প্রভা স্ফুরিত হইতেছে—রাজকন্যা তাঁহাকে স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিলেন না।

সেদিন বড় গরম। কোথাও গাছে পাতাটিও নড়িতেছে না। গ্রীষ্মবোধ করিয়া রাজকন্যা সখিগণ সহ অল্পে অল্পে সরোবরের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। দেখিলেন, জলে অনেক গুলি পদ্মফুল—কোনটি কলিকা—এখনও ফুটে নাই, কোনটি ফুটিয়া আছে, কোনটি গতকল্যকার বাসি ফুল—মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। রাজকন্যা দেখিলেন সেইরূপ একটি মুদ্রিতদল পদ্ম ধীরে ধীরে দুলিতেছে। ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তিনি সখিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

অনিলস্য গমো নাস্তি বিপদো নৈব দৃশ্যতে।
জলমধ্যে স্থিতং পদ্মং কম্পিতং কেন হেতুনা॥

—"বাতাস নাই, কোনও পাখীও দেখিতেছি না (যে বলিব, হয়ত পদ্মের উপর বসিয়াছিল, এইমাত্র উড়িয়া গিয়াছে, তাই দুলিতেছে) তবে জলমধ্যে স্থিত পদ্মটি কাঁপিতেছে কেন?"

সখিগণ পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল—কেহই রাজকন্যার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

কালিদাসের জপকাল কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে শেষ হইয়াছিল। রাজকন্যার শ্লোকটি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়াই রাজকন্যাকে চিনিতে পারিলেন।

সখীরা কেহ কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া কালিদাস বলিলেন

পাবকোচ্ছিষ্টবর্ণস্য শর্বর্য্যাং বন্ধনং কৃতং।
মোক্ষং ন লভতে কান্তে কম্পিতং তেন হেতুনা॥

—"হে কান্তে, অগ্নির উচ্ছিষ্ট (অর্থাৎ কালো) বর্ণ যার, তাকে অর্থাৎ ভ্রমরকে—পদ্ম) রাত্রিকালে (মুদ্রিত হইয়া) বন্ধন করিয়াছে, (ভ্রমর বাহির হইবার জন্য ভিতরে ছট্‌ফট্ করিতেছে) বাহির হইতে পারিতেছে না, তাই (পদ্ম) কাঁপিতেছে।"

এই উত্তর শুনিয়া, প্রথমেই রাজকন্যার বিস্ময়বোধ হইল যে, এ ব্যক্তি আমাকে "কান্তা" সম্বোধন করিতেছে কেন? এবং শ্লোকরচয়িতার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তি দেখিয়াও তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ আড়চোখে লোকটির পানে চাহিয়া, শেষে চিনিতে পারিলেন—ইনিই আমার সেই একরাত্রির স্বামী।

তখন রাজকন্যা স্বামীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, বিনয়নম্রমস্তকে, মিনতির স্বরে বলিলেন, "আমি তোমার মূল্য না বুঝিয়া, তোমায় চিনিতে না পারিয়া, তোমার সহিত অতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলাম। আমার অপরাধ তুমি মার্জ্জনা কর।"

কালিদাস বলিলেন, "রাজকুমারী, তুমি কোনও অপরাধ কর নাই—তোমায় মার্জ্জনা করিবার কিছুই নাই। তুমি আমার মহা উপকার করিয়াছ। তুমি যদি সেদিন আমার সহিত ওরূপ কঠোর ব্যবহার না করিয়া, আমায় আদর যত্ন করিতে, তবে আমি যেমন মূর্খ ছিলাম, চিরজীবন সেইরূপই থাকিয়া যাইতাম। তোমার নিকট ওরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া মনের দুঃখে আমি এই বনে

আসি, এবং মহাযোগীর সাক্ষাৎ পাই। তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া আমি কবিত্ব-বরলাভ করিয়াছি—কিন্তু তুমিই এ সকলের মূলীভূত কারণ। সুতরাং যাবজ্জীবন তোমার নাম কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক আমি স্মরণ করিব।"

রাজকন্যা স্বামীকে ফিরাইয়া নিজ পিতৃ-গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কালিদাস কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমা হইতেই আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে; সুতরাং তুমি আমার গুরুস্থানীয়া। কল্যাণি, তুমি গৃহে যাও,—তোমার সহিত আমার পতি-পত্নী ভাব এখন আর সম্ভব নহে।"

অবশেষে দুঃখিত চিত্তে রাজকন্যা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে কালিদাস গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, নানা দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে অবশেষে ধারা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কবিত্বখ্যাতি ইতিপূর্ব্বেই দেশবিদেশে রটিয়া গিয়াছিল। ধারাধিপতি ভোজরাজ, মহাসমাদরে তাঁহাকে নিজ সভায় সভাকবি করিয়া রাখিলেন।

সমাপ্ত